www.monerkhabor.com

বর্ষ ১ । সংখ্যা ৫ । মে ২০১৮

মানসিক স্বাস্থ্যের সবকিছু

মাসিক

মনের খবর

কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য

কর্মক্ষেত্রে মানসিক সমস্যার প্রভাব ও চিকিৎসা

৮ ঘণ্টা কাজ কেন

কাজ হোক আনন্দময়

ভালো থাকার জন্য নিয়ম মেনে চলি

ফরিদা পারভীন, সংগীত শিল্পী

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের প্রশ্নোত্তর

মা-সন্তানের সম্পর্ক বিজ্ঞান কী বলে?

কর্মব্যস্ততা প্রভাব ফেলে যৌনজীবনে

দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মনের ওপর প্রভাব

Valex CR®

Sodium Valproate and Valproic Acid
controlled release tablet

Quiet®

Quetiapine 25, 50 XR & 100 mg tablet

A different way to Calm

Incepta Pharmaceuticals Ltd
40, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani, Tejgaon I/A, Dhaka-1208, Bangladesh

Light to mental site
Lopez
Olanzapine 5 & 10 mg Tablet
Riscord
Risperidone 1, 2 & 4 mg Tablet
SETRA
Sertraline 25, 50 & 100 mg Tablet
Proval CR
Sodium Valproate and Valproic Acid
200, 300 & 500 mg Controlled Release Tablet
Relafin
Fluvoxamine 50 mg Tablet
mitrazin
Mirtazapine 7.5, 15 & 30 mg Tablet
S-Citapram
Escitalopram 5 & 10 mg Tablet
Tiapine XR
Quetiapine 50 & 200 mg ER Tablet
GENERAL
Pharmaceuticals Ltd.
Healthy life
Healthy living

Pasta
Get a taste of authentic Italian food with our delicious pasta dishes.The cheesy aroma of our ovener-baked pasta, and the tender meat in it, will surely make your mouth water!
Home Delivery
01723-684 068
cafe appeliano
Think Green, Eat Fresh
568, Block-C, Khilgaon, Dhaka-1219
Mobile: 01911285088, 01723684068
E-mail : cafeappeliano@gmail.com
www.facebook.com/CafeAppeliano

মাসিক **মনের খবর**

বর্ষ ১। সংখ্যা ৫
মে ২০১৮

উপদেষ্টা পর্ষদ

অধ্যাপক ডা. হেদায়েতুল ইসলাম
অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা বেগম
অধ্যাপক ডা. আব্দুস সোবহান
অধ্যাপক ডা. গোলাম রব্বানী
অধ্যাপক ডা. মো. রেজাউল করিম
অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম মুস্তাফিজুর রহমান
অধ্যাপক ডা. ঝুনু শামসুন্নাহার
অধ্যাপক ডা. ওয়াজিউল আলম চৌধুরী
অধ্যাপক ডা. ফারুক আলম
মামুনুর রশীদ
আজাদ আবুল কালাম
শিমুল মুস্তাফা

সম্পাদনা পর্ষদ

অধ্যাপক ডা. নিলুফার আক্তার জাহান
অধ্যাপক ডা. নিজাম উদ্দিন
অধ্যাপক ডা. নাহিদ মাহজাবিন মোরশেদ
ডা. জ্যোতির্ময় রায়
ডা. মো. মহসিন আলী শাহ
ডা. আর কে এস রয়েল
ডা. হেলাল উদ্দিন আহাম্মদ
আজিজুল পারভেজ

সম্পাদক
ডা. সালাহ্উদ্দিন কাউসার বিপ্লব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মাফরুহা সূবর্ণা

সহ-সম্পাদক
সাদিকা রুমন
মুহাম্মদ এ মামুন

প্রতিবেদক
মাহজাবীন আরা শান্তা
শারমিন নাহার

মার্কেটিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন
আবদুল্লাহ আল মামুন
মো. আসিফুজ্জামান আসিফ
আজিজুল ইসলাম
খাদিজা শুভ

গ্রাফিক ডিজাইন
মেহেদী হাসান
মাসুদ হাসান কিরণ

আইটি পরামর্শক
মাছুমুল হক
মো. শামসুল হক
খন্দকার তাজুল ইসলাম

যোগাযোগ
info@monerkhabor.com
ফোন : ০১৮১৮ ৩১৪২৬৪
৬৩১/এ (৩য় তলা) মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দেশিত শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি।

বর্তমান পৃথিবীতে শ্রমিকের অর্থনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি কর্মপরিবেশ, কর্মীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা, কর্মদক্ষতা, কাজের স্বীকৃতি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, খাদ্য এবং বিনোদনসহ অনেক বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ভাবা হয়। কর্মরত শ্রমিকের মানসিক রোগ কিংবা সমস্যা সময়মতো নিরুপণ এবং সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও জরুরি।

আনন্দ সহকারে চালিয়ে যাওয়া যেকোনো শ্রমে ক্লান্তিও কম। শুধু নির্দিষ্ট ঘণ্টা বা সময় নয়, কর্মস্থলে যথাযোগ্য পরিবেশও নিশ্চিত হোক। মনকে চাঙ্গা রেখে সেই পরিবেশে মানুষ কাজ করবে সেটাই কামনা। দিন শেষে, সপ্তাহ, মাস, কর্মঘণ্টা শেষে, আবার নিজেকে খুশি মনে প্রস্তুত করবে পরবর্তী কাজের জন্য, এমন পরিবেশই কামনা করছি এই মে দিবসে।

বিশ্ব মা দিবসও এই মে মাসে। 'মা' শব্দটি এত কেন মধুর, এত কেন নিরাপদ? মধুরতম এই সম্পর্কের প্রতিটি বিন্দু সবার ঘরে সমানভাবে থাকুক। পৃথিবীর সকল মা ভালো থাকুক।

সুস্থ থাকুন মনে প্রাণে।

প্রচ্ছদ ছবি : **কাকলী প্রধান**

মাসিক মনের খবর। ডা. সালাহ্উদ্দিন কাউসার বিপ্লব কর্তৃক আঁচড় মিডিয়া প্রিন্টিং প্রেস ৬/খ, প্লট-৩৭, রোড-১ মিরপুর-১০, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ৬৩১/এ (৩য় তলা) মগবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

মূল্য : ৫০ টাকা

সূ চি প ত্র

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য

কর্মক্ষেত্রে মানসিক সমস্যার প্রভাব ও চিকিৎসা

কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যার কারণে কারখানায় কর্মরত একজন ছোট কর্মচারীর মতো বড় কর্পোরেট অফিসে ল্যাপটপের সামনে বসে থাকা স্যুট-টাই পরিহিত চৌকস কর্মকর্তাটিরও হতে পারে মানসিক সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) রিপোর্ট অনুযায়ী, সারা বিশ্বে কর্মরত মানুষের মধ্যে ২০ শতাংশেরও বেশি লোক মানসিক সমস্যার শিকার।

পৃষ্ঠা ৬

৮ ঘণ্টা কাজ কেন

পৃষ্ঠা ১০

কাজ হোক আনন্দময়

পৃষ্ঠা ১২

ভালো থাকার জন্য নিয়ম মেনে চলি

ফরিদা পারভীন

সঙ্গীত শিল্পী

কিংবদন্তিতুল্য সঙ্গীত শিল্পী তিনি। বিশেষ করে লালন শিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি আকাশছোঁয়া। সঙ্গীতময় কর্মজীবনে তিনি গেয়েছেন লোকগান, আধুনিক, দেশাত্মবোধকসহ অসংখ্য গান। পেয়েছেন ফুকুওয়াকা এশিয়ান কালচারাল প্রাইজ, রাষ্ট্রীয় একুশে পদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ দেশে-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। তিনি ফরিদা পারভীন। মনের খবর পাঠকদের এবার তিনি জানাচ্ছেন তাঁর মনের কথা, ভালোলাগার কথা, স্বপ্নের কথা, পরিকল্পনার কথা, জীবন দর্শনের কথা।

পৃষ্ঠা ৩৬

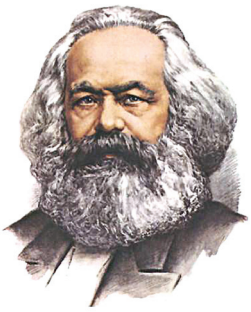

ইংল্যান্ড তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে কিন্তু তাঁর নাগরিকত্বের আবেদন নাকচ করেছে। মৃত্যুকালে মার্কস কোনো দেশেরই নাগরিক ছিলেন না। এজন্যই কি তিনি এখন বিশ্বনাগরিক?

ব্যক্তিত্ব

কার্ল মার্কস

পৃষ্ঠা ৪০

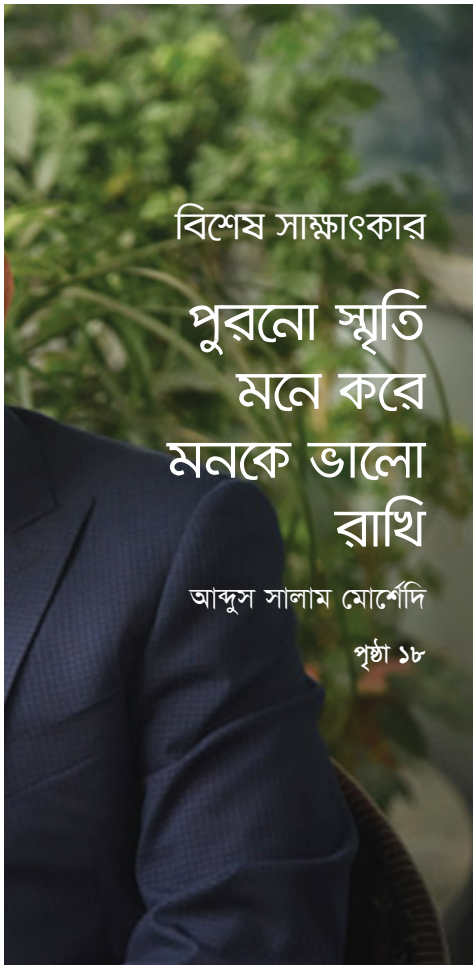

বিশেষ সাক্ষাৎকার

পুরনো স্মৃতি মনে করে মনকে ভালো রাখি

আব্দুস সালাম মোর্শেদি

পৃষ্ঠা ১৮

বিশেষ আয়োজন

মা-সন্তানের সম্পর্ক

বিজ্ঞান কী বলে?

পৃষ্ঠা ২২

প্রত্যেক মানুষ নির্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব জীবন চায়, যেখানে শান্তি এবং স্বস্তিই কাম্য, কিন্তু না চাইলেও জীবনে চলার পথে নানাবিধ অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ কিংবা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। সারা পৃথিবী জুড়েই মিল-কারখানা, যানবাহন জলবায়ু আর প্রকৃতির নানা খেয়ালে হাজারো মানুষের জীবনে অসংখ্য দুর্যোগ হাজার রকমের দুর্ভোগ নিয়ে আসে।

দুর্যোগ-দুর্ঘটনা

মনের ওপর প্রভাব

পৃষ্ঠা ৪৪

মাদকাসক্তি

পরোক্ষ ধূমপান

ক্যান্সার, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়

পৃষ্ঠা ২৮

মানসিক স্বাস্থ্য

অকুপেশনাল থেরাপি

পৃষ্ঠা ২৬

যৌনস্বাস্থ্য

কর্মব্যস্ততা প্রভাব ফেলে যৌনজীবনে

পৃষ্ঠা ৩২

প্রবীণ মন

বৃদ্ধদের দায়িত্ব কার?

পৃষ্ঠা ৩৪

টিপস

কীভাবে গুছিয়ে কাজ করবেন

পৃষ্ঠা ৫৮

কর্মক্ষেত্রে মানসিক সমস্যার প্রভাব ও চিকিৎসা

ডা. পঞ্চানন আচার্য্য
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

ছবি : কাকলী প্রধান

কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যার কারণে কারখানায় কর্মরত একজন ছোট কর্মচারীর মতো বড় কর্পোরেট অফিসে ল্যাপটপের সামনে বসে থাকা স্যুট-টাই পরিহিত চৌকস কর্মকর্তাটিরও হতে পারে মানসিক সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) রিপোর্ট অনুযায়ী, সারা বিশ্বে কর্মরত মানুষের মধ্যে ২০ শতাংশেরও বেশি লোক মানসিক সমস্যার শিকার। এক গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মস্থলে অতিরিক্ত চাপ বোধ করেন ৩০ শতাংশেরও বেশি কর্মী

আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে শিক্ষিত লোক মাত্রেই দুটি রচনা অবশ্যই শিখেছেন–প্রাথমিকে গরুর রচনা আর মাধ্যমিকে শ্রমের মর্যাদা। তা সত্ত্বেও শ্রমের মর্যাদা আমরা কতটুকু দিতে পারি সেটা বলাই বাহুল্য। শ্রমিকের মানসিক দিক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা আমাদের কাছে অনেক দূরের বিষয়। আবার 'শ্রমিক' বললেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে অসম্ভব শারীরিক পরিশ্রমরত কিছু মানুষের ছবি। শব্দটির এই অর্থে বহুল ব্যবহারই হয়তো এর কারণ। শ্রম কিন্তু দুই ধরনের; কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রম। তাই 'শ্রমিক' শব্দটিও ব্যাপক অর্থে উভয় ধরনের শ্রমরত মানুষকে বোঝায়। শুরুতেই জানিয়ে রাখি, আজকের লেখায় আমরা এই ব্যাপক অর্থটি এবং সেইসঙ্গে 'কর্মী' শব্দটা ব্যবহার করব।

শ্রমিকদের মানসিক সমস্যা নিয়ে সারাবিশ্বেই রয়েছে একধরনের অবহেলা, অনেক ভুল ধারণা এবং যথাযথ সচেতনতার অভাব। কিন্তু এর ব্যাপকতা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শ্রমিকদের মানসিক অবস্থা, মানসিক সমস্যাকে অগ্রাহ্য করে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। গবেষণা বলছে–কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যার কারণে কারখানায় কর্মরত একজন ছোট কর্মচারীর মতো বড় কর্পোরেট অফিসে ল্যাপটপের সামনে বসে থাকা স্যুট-টাই পরিহিত চৌকস কর্মকর্তাটিরও হতে পারে মানসিক সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) রিপোর্ট অনুযায়ী, সারা বিশ্বে কর্মরত মানুষের মধ্যে ২০ শতাংশেরও বেশি লোক মানসিক সমস্যার শিকার। এক গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মস্থলে অতিরিক্ত চাপ বোধ করেন ৩০ শতাংশেরও বেশি কর্মী। আর কর্মস্থলের এই চাপ কমপক্ষে ১৫ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অক্ষমতাজনিত ক্ষতিপূরণ-দাবির পেছনের কারণ। তাই এটি শুধু অনুন্নত দেশের সমস্যা নয়, উন্নত বিশ্বেরও সমস্যা। বিভিন্ন কারণেই কর্মক্ষেত্রে একজন শ্রমিকের মানসিক অসুবিধা এমনকি মানসিক রোগ হতে পারে। এটা হতে পারে নতুন কাজে যোগদান অথবা অবসরে যাওয়ার জন্য; হতে পারে কর্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ উচ্চতর পদে পদোন্নতি না হওয়া অথবা অদক্ষতার জন্য ছাঁটাই হওয়ার কারণে। একইভাবে অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জিং কিংবা চ্যালেঞ্জবিহীন ম্যাড়ম্যাড়ে চাকরি উভয়েই মানসিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এককথায় বলা চলে যে-কোনো কারণে চাকুরিগত অসন্তুষ্টি (Job Dissatisfaction) হলেই তা মানসিক অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। এই চাকুরিগত অসন্তুষ্টির পেছনে আবার অনেক ধরনের বিষয় প্রভাবকের ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন : ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে না পারা, সহকর্মীদের অসহযোগী মনোভাব, তীব্র প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, হিংসা, গঠনমূলকভাবে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের অভাব। যারা কম দক্ষতাসম্পন্ন এবং সে-কারণে কম মজুরি পান তারা সাধারণত একইসঙ্গে চাকুরির স্থায়িত্ব নিয়েও বেশি অনিশ্চয়তায় ভোগেন। ইদানীং বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মী ছাঁটাই বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও বেশি দেখা দিচ্ছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ঐসব প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা শ্রমিকদের মধ্যে তৈরি হয় একধরনের আশাহীন এবং অসহায় মনোভাব। যার ফলে তৈরি হতে পারে মানসিক রোগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি হিসেবে যেসব বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে সেসব হলো :

- অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কৌশল
- কর্মীদের সাথে দুর্বল যোগাযোগ এবং পরিচালনা-কৌশল
- সিদ্ধান্ত তৈরিতে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা অথবা একজনের নিজের কর্মক্ষেত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতা
- কর্মীদের প্রতি সহযোগিতার অভাব
- অনমনীয় কর্মঘণ্টা
- কাজের পরিধি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা।

আবার বিশ্বের প্রায় সবখানেই এখনো নারীরা পুরুষের তুলনায় কম বেতন পান, যে-কোনো সময় চাকরি হারানোর ভয়ে বেশি ভোগেন। এমনকি কর্মক্ষেত্রেও তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের চাপের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, বৈষম্যমূলক মন্তব্য, গতানুগতিক ধারণাপ্রসূত তির্যক মন্তব্য, যৌন হয়রানি প্রভৃতি। তদুপরি, চাকুরির পাশাপাশি ঘরের যাবতীয় কাজ যেমন–বাচ্চার যত্ন নেয়া, বয়স্কদের দেখভাল করাসহ আরো নিত্যদিনের পারিবারিক কাজের দায়িত্ব, নারীদেরকেই বেশি করতে হয়। এটা তার জীবনে চাপের পরিমাণ অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। এর বাইরে অনেক সময় ধর্ম-বর্ণ-গায়ের রং প্রভৃতির কারণেও চাকুরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। এই সবকিছুই তৈরি করতে

পারে মানসিক সমস্যা।
মানসিক সুস্থতা বলতে একজন মানুষের আবেগীয়, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিকভাবে ভালো থাকাকে বোঝায়। এটি মূলত একজন মানুষের চিন্তা, অনুভূতি আর আচরণের স্বাভাবিকতাকেই নির্দেশ করে। অতএব, এসব ক্ষেত্রে যে-কোনো ধরনের অসুবিধা বা বিচ্যুতিকেই মানসিক সমস্যা বলা চলে। শ্রমিকদের মানসিক সমস্যাগুলোও তাই সাধারণ মন খারাপ, সাময়িক দুশ্চিন্তা বা হঠাৎ ক্ষণস্থায়ী আচরণের পরিবর্তন থেকে শুরু করে বড় বড় মানসিক রোগ পর্যন্ত গড়াতে পারে। মানসিক চাপজনিত বিভিন্ন সমস্যাই এক্ষেত্রে বিশাল অংশ জুড়ে আছে। সাধারণত এসব সমস্যা কখনো বাড়ে আবার কখনো কমে যায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই সময়ে সময়ে খারাপ থাকার এই সব দিনগুলোতে কেউ চিকিৎসা বা অন্য কোনো ধরনের সহায়তা নেন না। মানসিক রোগের কথা বলতে গেলে মূলত বিষণ্নতা ও উদ্বিগ্নতাজনিত রোগই প্রধান। এদের সাথে থাকতে পারে ঘুমের সমস্যা, যৌনজীবনে বিভিন্ন অসুবিধা। এছাড়াও হতে পারে বাইপোলার ডিজঅর্ডার, বিভিন্ন আসক্তিজনিত সমস্যা (মাদক, জুয়া), অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার, সিজোফ্রেনিয়া। তবে শুধু পেশাগত কারণে এসব রোগ হওয়ার হার যথেষ্ট কম। কোনো দুর্ঘটনা বা অনভিপ্রেত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে হতে পারে পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার। একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো–অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব মানসিক রোগের প্রকাশ ঘটে শারীরিক লক্ষণের মাধ্যমে। গবেষণায় দেখা গেছে–সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত লক্ষণগুলো হলো 'মাংসপেশি ও অস্থিসন্ধির (Musculoskeletal) সমস্যা' এবং 'পৌষ্টিকতন্ত্রের (Gastro-intestinal) গিরায় ব্যথা, পেটে ব্যথা প্রভৃতি। পৌষ্টিকতন্ত্রের সমস্যার মধ্যে বদহজম, বুক জ্বালাপোড়া, প্রচলিত ভাষায় গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি অন্যতম। সর্বোপরি, মানসিক সমস্যা বা মানসিক রোগ একজন শ্রমিকের শারীরিক রোগের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই বলা চলে–শ্রমিকদের মানসিক সমস্যা বহুমাত্রিক এবং বিস্তৃত।
মানসিক এসব সমস্যা বা রোগ একজন মানুষের

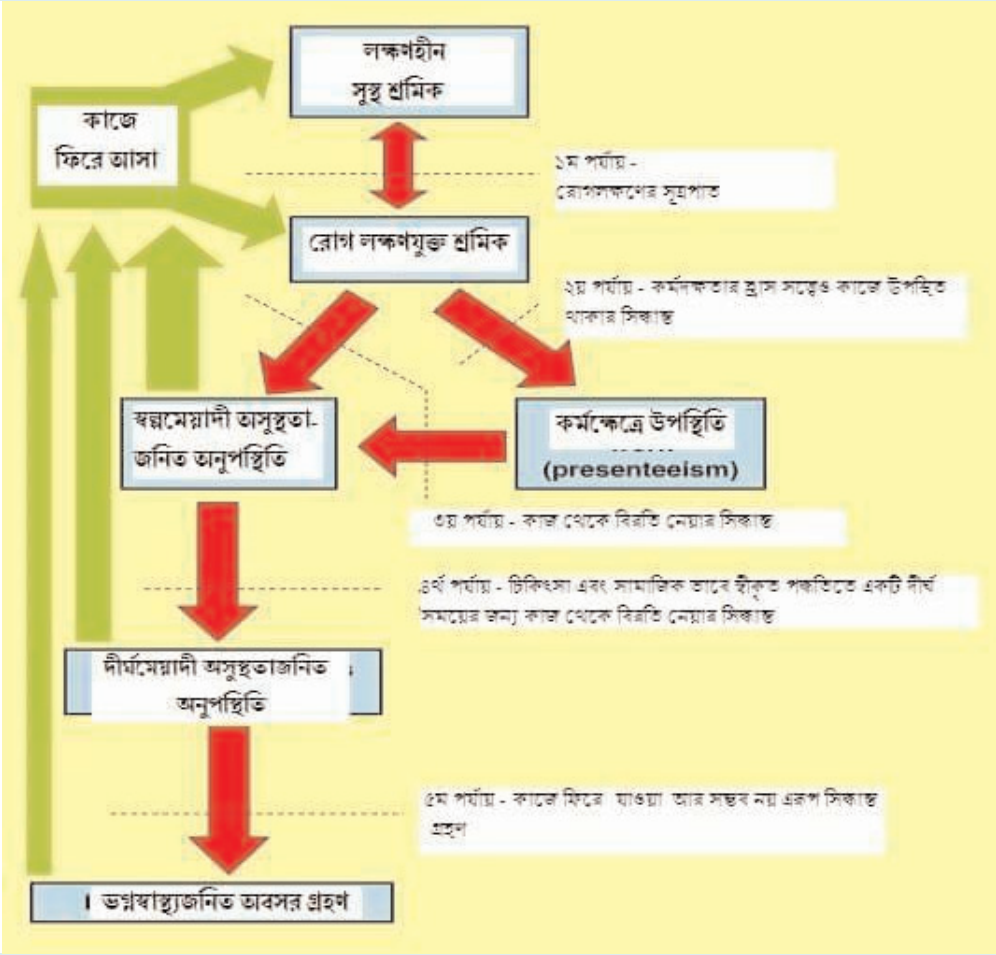

পেশাগত ক্ষেত্রে যে-সকল অসুবিধা তৈরি করতে পারে তা হলো :

- কাজে অনুপস্থিতি : রোগের কারণে, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য, চাপ মোকাবেলায় অক্ষমতার কারণে, বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার জন্য (উচ্চ রক্তচাপ, ঘুমের সমস্যা, বিভিন্ন ব্যথাজনিত সমস্যা, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে বারবার বিভিন্ন সংক্রমণের শিকার হওয়া প্রভৃতি)।
- কাজের মানের অবনতি : সৃজনশীলতা/উৎপাদন ক্ষমতা কমা, ভুলের মাত্রা বৃদ্ধি, সিদ্ধান্তহীনতা, সঠিক পরিকল্পনা করতে না পারা।
- শ্রমিকের আচার-আচরণের পরিবর্তন : উদ্যমহীনতা, প্রতিশ্রুতির অভাব, সময় ধরে কাজ করতে না পারা, চাকুরি পরিবর্তন/ছেড়ে দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি।
- কর্মক্ষেত্রে সম্পর্কের জটিলতা : সহকর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-রেষারেষি বৃদ্ধি, গ্রাহকদের সাথে দুর্ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার অবনতি।

বাম পাশের পৃষ্ঠার ছবিতে মানসিক সমস্যার শুরু থেকে শেষ পরিণতি এবং কর্মজীবনে তার প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

সমস্যার কথাতো অনেক হলো। এবার আসুন সমাধান কী জানা যাক। আগেই বলেছি সমস্যাটি বহুমাত্রিক। তাই সমাধানের পথও বহুমাত্রিক। এটি হতে পারে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে, চিকিৎসকের দিক থেকে, সামাজিক পর্যায়ে এবং অবশ্যই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে।

বিভিন্ন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সমাধানের ব্যাপারে অনেকভাবেই আলোচনা করা হয়েছে বা নির্দেশিকা দেয়া আছে বিভিন্ন সংস্থা বা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে। World Economic Forum এর মতে এই সমস্যা মোকাবেলায় তিনটি প্রধান উপায়ের সমন্বয়ে আমাদের এগোতে হবে। উপায়গুলো হলো :

- পেশাগত ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা
- পেশাগত কাজের বিভিন্ন ভালো দিক এবং কর্মীদের দক্ষতার জায়গাগুলোর উন্নয়ন করার মাধ্যমে মানসিক সুস্বাস্থ্যকে উদ্বুদ্ধ করা
- কারণ যাই হোক না কেন, মানসিক অসুবিধা বা অসুস্থতাকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেয়া।

এক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) একটু বিস্তারিতভাবে সমাধানের উপায় আলোচনা করেছে। যেখানে বলা হয়েছে :

- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কৌশল প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন
- কর্মীদেরকে নিশ্চিত করা যে, প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা আছে
- কর্মীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে তারা একধরনের অংশীদারিত্ব অনুভব করে
- কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া
- কর্মীদের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া এবং তার পুরস্কার দেয়া

এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চেষ্টারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যেমন–নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নিয়মিত ব্যায়াম, যোগাভ্যাস, মেডিটেশন, বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি। আর যদি মানসিক অসুবিধা বা সমস্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় সেক্ষেত্রে মনোবিদ (Psychologist) বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের (Psychiatrist) পরামর্শ নেয়া। এক্ষেত্রে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন অনুসারে ঔষধ অথবা সাইকোথেরাপির পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সাইকোথেরাপির মধ্যে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপির ভূমিকাটাই বেশি। আমাদের দেশে এখনো সেই অর্থে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট তৈরি হয়নি। উন্নত দেশে অকুপেশনাল থেরাপিস্টরা কর্মস্থলেই কাউন্সেলিং, সাইকোথেরাপি দেয়ার কাজটি করে থাকেন। এছাড়া 'কর্মী সহায়তা কার্যক্রম' বা Employee Assistance Programmes (EAPs) একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যেটা কর্মস্থলে বসেই দেয়া সম্ভব। আমাদের দেশে মনোবিদদের মাধ্যমেও এই কার্যক্রম ভালোভাবেই চালানো সম্ভব, শুধু প্রয়োজন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা।

সমাধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পেশাগত পুনর্বাসন (Vocational Rehabilitation)। এখানেই রাষ্ট্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। রাষ্ট্রই পারে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও বিভিন্ন খাতের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি কার্যকর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালু করতে। এছাড়াও রাষ্ট্রের সহায়তায় সম্ভব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার করে এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি। এতে করে অবসান ঘটবে ভুল ধারণার, বৃদ্ধি পাবে মানসিক সমস্যায় পড়লে সহায়তা চাওয়ার হার।

শ্রমিকদের মানসিক সমস্যা হওয়া এবং তার প্রভাবে উৎপাদন ক্ষমতা কমা ও আরো বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক এখন সর্বজনস্বীকৃত। তাই এর প্রাথমিক অবস্থাতেই শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আরো কর্মক্ষম একটি জাতি গড়ে তোলার দিকে এখনই মনোনিবেশ করা উচিত।

তথ্যসূত্র : 1. Henderson, M., Harvey, S., Øverland, S., Mykletun, A., & Hotopf, M. (2011). Work and common psychiatric disorders. Journal of the Royal Society of Medicine, 104(5), 198–207. http://doi.org/10.1258/jrsm.2011.100231
2. http://www.who.int/mental_health/media/en/712.pdf

ছবি : কাকলী প্রধান

৮ ঘণ্টা কাজ কেন

ডা. মো. ওয়ালিউল হাসনাত সজীব
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

পেশার জগতে সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছানোর ইচ্ছে কার না থাকে। আর তাই উন্নতি, অর্থ আর সম্মানের পথে অবিরত ছুটে চলা। খাওয়া, ঘুম হারাম করে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ঘাড়, মুখ গুঁজে দিবারাত্রি খেটে চলেছেন কত মানুষ। বিনোদন পালাই পালাই।

আমাদের শরীর খুবই অনুগত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অকারণে তার ওপর চাপ বাড়াতেই থাকবেন। যত চাপ বাড়াবেন, তত তাড়াতাড়ি তার বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা বেড়ে যাবে। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত কাজ করার মানে এই নয় যে আপনি অতি দক্ষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অফিসে কাটানো সার্থক করতে গিয়ে কর্মক্ষমতা হারাতে চলেছেন, তা কি একবারের জন্যও ভেবে দেখেছেন?

নিজ প্রয়োজন বা মালিকশ্রেণির মুনাফা বৃদ্ধি–যে কারণেই হোক, যারা দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি সময় অফিসে কাজ করে কাটান, তাদের জন্য কিন্তু ভবিষ্যতে অপেক্ষা করছে মহাবিপদ। একটি গবেষণা বলছে, দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে মৃত্যুর সময় এগিয়ে আসবে।

শ্রম-আইন অনুযায়ী, সরকারি ও বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কর্মচারীদের দৈনিক কাজের স্বীকৃত সময় এখন ৮

ঘণ্টা। কিন্তু সেই ৮ ঘণ্টাই নয়, এমনকি কর্মদিবস ১০-১২ ঘণ্টাতেও রূপান্তরিত হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) দাবি করে যে, বাংলাদেশের শ্রম-আইনে দৈনিক কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা নির্ধারিত থাকলেও অন্তত ৮০ শতাংশ শ্রমিককে তার বেশি সময় কাজ করানো হয়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মতো উন্নত দেশেও ওভারটাইম এবং এক্সটেন্ডেড ওয়ার্ক শিফট অনেক বেশি। *ওভারটাইম* হচ্ছে সাপ্তাহিক ৪০ ঘণ্টার বেশি কাজ আর *এক্সটেন্ডেড ওয়ার্ক শিফট* বলতে দৈনিক ৮ ঘণ্টার অধিক কাজকে বোঝায়। তবে বাৎসরিক কর্মঘণ্টা হিসেবে সবচেয়ে ওপরে আছে দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং এবং থাইল্যান্ডের নাম।
গত ১০ বছর ধরে আমেরিকা, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ায় চালানো গবেষণায় দেখা যায়, যারা প্রতি সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার বেশি অফিসে কাজ করেন, তাদের স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ৩৫ ভাগ এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যমতে তা অন্যান্য মানুষের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেশি। শুধু তাই নয়, ১৫ ভাগ ক্ষেত্রে বেড়ে যায় হার্টের সমস্যাও। আর এই মারণরোগের হাত ধরে কখন যে ডায়াবেটিস শরীরে জায়গা করে নিয়েছে বুঝতেই পারবেন না। অর্থ আর উন্নতির লক্ষ্যে খাওয়া-ঘুম ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অফিসে কাজের ফলে শরীরে নিঃশব্দে বাসা বেঁধে আছে এই নীরব ঘাতক। আর ডায়াবেটিসের হাত ধরে আসছে আরো কয়েকটি মারণরোগ।
ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন (আইডিএফ) এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, এক জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাজ করা, কায়িক পরিশ্রমের অভাব ও অনিয়মিত জীবনযাপনের ফলে শরীরে দেখা দিচ্ছে টাইপ-২ ডায়াবেটিস। লন্ডনের এক দল গবেষক দেখিয়েছেন যে, শুধুমাত্র এক সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করলেই শরীরে শর্করার ভারসাম্য নষ্ট হয়। আর ডায়াবেটিস থাকলে, অন্যান্য রোগগুলি সহজে সারতেও চায় না। তাছাড়া ডায়াবেটিস আক্রান্ত হলে ক্লান্তিবোধ, ঘুমঘুম পাওয়া, অমনোযোগিতার মতো সমস্যাও দেখা দেয়।
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা অফিসে বেশি সময় কাটান তাদের মধ্যে অল্প বয়সে মৃত্যু ঝুঁকি প্রায় দ্বিগুণ এবং যা ধূমপানের মতোই শরীরকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করতে থাকে।
অতিরিক্ত কাজের চাপ, কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শরীরকে বয়ে নিয়ে যায় মৃত্যুকূপে।
অতিরিক্ত কাজের চাপ শরীরে ডায়াবেটিস, হৃদরোগের ঝুঁকি যেমন বাড়াচ্ছে তেমনি নানাবিধ মানসিক সমস্যারও কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ছাড়াও বিষণ্ণতার ঝুঁকি অনেক অনেক বেশি।
উন্নত বিশ্বের দেশ জাপান–যেখানে কাজের চাপ অনেক বেশি। সে দেশের গবেষকরা দেখেছেন যে, অধিক কাজ হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়ে অপরিণত বয়সে মৃত্যু ডেকে আনছে। জাপানিজরা একে 'কারশি' বলে অর্থাৎ অধিক কাজে মৃত্যু। সে দেশের গবেষকরা আরো দেখিয়েছেন যে, অধিক কাজ মানুষের মধ্যে দুশ্চিন্তা, বিরক্তি, অস্থিরতার জন্ম দেয় এবং শরীরকে অবসন্ন করে।
বিভিন্ন দেশে চালিত প্রায় ২২টি গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত কাজ স্বাস্থ্যঝুঁকি, নানাবিধ দুর্ঘটনা এমনকি মৃত্যুহার অনেক গুণ বৃদ্ধি করে। গবেষণায় এদের মধ্যে ধূমপান, মদ্যপানের মতো নেশাদ্রব্য গ্রহণের মাত্রা যেমন বেশি দেখা গেছে তেমনি মনস্তাত্ত্বিক কার্যক্ষমতাও এদের কমে যাচ্ছে।
বেশি কাজ, বেশি ফল, ব্যাপারটা কি তাই? সুইডিস গবেষণা বলে ভিন্ন কথা। সুইডিস সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে অবসরপ্রাপ্ত সেবিকাদের মধ্যে চালিত গবেষণায় তাদের ৮ ঘণ্টা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দৈনিক ৬ ঘণ্টা কাজ দিয়ে দেখা গেছে, কাজের পরিমাণ ছাড়াও কাজের গুণগত মান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তাদের মধ্যে অসুস্থতাজনিত ছুটি, মানসিক চাপও অনেক কম ছিল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষক দেখিয়েছেন যে, দৈনিক ৪ ঘণ্টা কাজ করে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করা সম্ভব।
প্রশ্ন ছিল ৮ ঘণ্টা কাজ করব কেন? যদি চান এই ধরণীতে আরো কিছুটা দিন সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে, আরো অবকাশ, জীবনকে আরো উপভোগ্য করে গড়ে তুলতে তবে তো সেটাই উচিত। আর এ ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ ফল আমাদের পাশে আছে।
গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে আমারাও দু-হাত বাড়িয়ে বরণ করেছি মে দিবসকে। দুনিয়ার কসাইখানা হিসেবে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের *হে মার্কেটে* ১৮৮৬ সালে ১লা মে, শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে মোকাবেলা করার জন্য গর্জে ওঠে বন্দুক। ঘামে ভেজা শ্রমিকদের জামা-কাপড় ক্ষতবিক্ষত দেহের রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে। শ্রমিকশ্রেণি তাঁদের জীবনের বিনিময়ে আমেরিকার ধূসর মাটিতে রক্তের অক্ষরে ইতিহাসের এক নতুন ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যময় অধ্যায় রচিত করে। ১৮৯০ সালে স্থির হয় বিশ্বব্যাপী ১লা মে তারিখটি *মে দিবস* হিসেবে পালিত হবে। এরপর থেকেই পহেলা মে দিনটিকে শ্রমিকরা আন্তর্জাতিকভাবে মহান *মে দিবস* তথা *শ্রমিক দিবস* হিসেবে পালন করে আসছেন।
বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ এলাকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণির কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানকার শ্রমজীবী মানুষের কাছে *মে দিবস* উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। কিন্তু বিশ্বের বাকি অংশের শ্রমজীবী মানুষ ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে এখনো এই দিনটিকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন হিসেবে পালন করে। আমরা যারা অর্থ, যশ আর অপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে অথবা অফিসের বসকে খুশি করতে দিবারাত্রি খেটে চলেছি আসুন এই দিনটিতে দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ না করার প্রতিজ্ঞা করি। প্রতিজ্ঞা করি সুস্থভাবে বাঁচার, জীবনকে উপভোগ করার।

কাজ হোক আনন্দময়

তানজির আহমেদ তুষার
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট
সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ছবি : **কাকলী প্রধান**

শ্রম-শ্রমিক-কর্মকর্তা ও কারখানা সব একই সূত্রে গাঁথা। যেন সবাই একই নৌকার যাত্রী। কারখানা বাঁচলে শ্রমিক বাঁচে, শ্রমিক ভালো থাকলে কারখানায় উৎপাদন বাড়ে। গবেষণা বলছে শ্রমিক বা কর্মীর কাজ যদি আনন্দঘন হয় তবে ১২% উৎপাদন বাড়ে, বিক্রয়কর্মী আনন্দে থাকলে ৩৭% বিক্রি বাড়ে, কর্মস্থল আনন্দের হলে শ্রমিকরা কম ছুটি নেন ও কর্মত্যাগের প্রবণতাও কমে যায়। তাই উৎপাদনের স্বার্থে, দেশের প্রবৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিকের কাজ ও কর্মস্থল হতে হবে আনন্দের। শ্রমিকের কাজ আনন্দঘন করার জন্য মালিক, কর্মকর্তা ও শ্রমিক সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। চলুন দেখি কাজ ও কর্মস্থলকে আনন্দঘন করার জন্য আমরা কী কী করতে পারি।

সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ

কর্মক্ষেত্র সুন্দর হলে কাজের মধ্যে সন্তুষ্টি বাড়ে। শরীর ও মন সুস্থ থাকে। তাই শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গোছালো ও প্রয়োজনীয় আলো-বাতাসপূর্ণ হতে হবে। আর এর জন্য মালিক, কর্মকর্তা ও শ্রমিক সবাইকেই যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত বিরতি

কাজ ও বিশ্রাম একই মুদ্রার এ-পিঠ ও-পিঠ। কাজের ধরন অনুযায়ী কাজের ফাঁকে সুনির্ধারিত বিরতির ব্যবস্থা করলে কাজ ভালো হবে। আবার এই বিরতিতে বিশ্রামের জন্য বা অন্য কোনো প্রয়োজনে কাউকে যাতে দূরে সরে যেতে না হয় সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। এ সময়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও আনন্দ বিনোদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সংগীত

পৃথিবীর সব মানুষ সংগীত পছন্দ করে। নিউরো-কগনিটিভ মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেছেন সংগীত মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ কতগুলো জায়গাকে উদ্দীপিত করে। ফলে মানুষ আনন্দিত হয়। শ্রমিকের কাজের সময়ে সংগীত চালু থাকলে কাজের গতি ও মনোযোগ বাড়ে। এছাড়া শ্রমিকের ক্লান্তিবোধ আসে দেরিতে।

যন্ত্রপাতিগুলো মানব প্রকৌশলসম্মত হতে হবে

কাজের সময়ে সবাইকেই কোনো না কোনো যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। সেই যন্ত্রটা যদি ব্যবহার-বান্ধব হয় তাহলে কাজের পরিমাণ ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর সব উন্নত দেশে তাদের নাগরিকদের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যন্ত্রগুলোর ডিজাইন করা হয়ে থাকে। এতে শ্রমিকের যেমন কাজ করতে ভালো লাগে তেমনি গুণগতমান এবং উৎপাদন হার বৃদ্ধি পায়।

বিনামূল্যে খাবার

গবেষণায় দেখা যায়, যেসব প্রতিষ্ঠানে কর্মকালীন সময়ে বিনামূল্যে খাবার প্রদান করা হয় তাদের শ্রমিকেরা বেশি সন্তুষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের শরীর ও মন ভালো থাকার সম্ভবনা বাড়ে। সময় নষ্ট হয় না এবং শেষ পর্যন্ত তা কাজের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়।

বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা

শ্রমিকেরা শ্রম দেয় পারিশ্রমিকের জন্য। তাদের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রদান করতে হবে। এতে মালিকের প্রতি শ্রমিকের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়ে। পাশাপাশি যাতায়াত,

চিকিৎসা, সন্তানদের লেখাপড়াসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

প্রশিক্ষণ কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। আর দক্ষ শ্রমিক কম কষ্টে ও কম সময়ে বেশি কাজ করতে পারে। দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে মানুষ কাজে আনন্দ পায়। যে কাজটা করতে আগে চাপ লাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে সেই কাজই মানুষ আনন্দের সাথে করতে পারে। দক্ষতা অনুযায়ী কাজের জায়গা বা ধরন পরিবর্তন অনেক সময়ে একঘেয়েমি কাটাতে সাহায্য করে।

দক্ষতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ

আবার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটালেই শুধু হবে না, দক্ষতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। দক্ষতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পেলে মানুষের কর্মসন্তুষ্টি বাড়ে, সাথে উৎপাদনও বাড়ে।

কাজের স্বীকৃতি, পুরস্কার ও পদোন্নতি

প্রতিটা মানুষ তার কাজের স্বীকৃতি চায়। কাজের স্বীকৃতি দিলে মানুষের কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং কাজটি আনন্দের সাথে করতে পারে। মাঝে মাঝে আর্থিক বা অনার্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করলে সবার মধ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। মানুষ তার দক্ষতা বৃদ্ধি করে আরো ওপরের লেভেলে কাজ করতে চায়। তার এই চাওয়াটা পূর্ণ হওয়ার সুযোগ কর্মস্থলে থাকতে হবে। তাহলে সে কাজকে চাপ মনে না করে চ্যালেঞ্জ মনে করবে।

সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলা

কর্মস্থলে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে সে শৃঙ্খলা হতে হবে সবার জন্য সমান। ধর্ম, বর্ণ, বাসস্থান, নিজ জেলা বা রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে পার্থক্য থাকলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তুষ্টি কাজ করে। একই সাথে কর্ম ফাঁকি দেয়ার একটি প্রবণতা তৈরি হয়। তাই সবার জন্য একই নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রমিকরা মহৎ কাজের অংশ

কর্মী বা শ্রমিক কীভাবে একটি বড় ও মহৎ কাজের সাথে যুক্ত আছে তা তাকে বুঝতে সাহায্য করতে হবে। কাজটির গুরুত্ব সঠিকভাবে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদের কাজ কীভাবে দেশ ও জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝিয়ে দিতে হবে। তাহলে শ্রমিক কাজটি করতে যেমন আনন্দ ও গর্ব অনুভব করবে তেমনি কাজের মানও ভালো হবে।

ব্যক্তিগত ও দলগত সমস্যার সমাধান করতে হবে

কর্মস্থল ও কর্মস্থলের বাইরে শ্রমিকের বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত সমস্যা হতে পারে। সে সমস্যাগুলোর কারণে তাদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটতে পারে। ফলে কাজের গতি কমে যেতে পারে, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি বাড়তে পারে ও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই তাদের ব্যক্তিগত ও দলগত সমস্যাগুলো সমাধানে পরামর্শ ও কাউন্সেলিং-সেবা চালু রাখা যেতে পারে।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা

আনন্দে থাকার জন্য আমাদের শরীর ও মন ভালো থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের কোনো সমস্যা হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দিলে শ্রমিক ভালো থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানও নানাভাবে উপকৃত হবে। শ্রমিক যত সুস্থ ও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকবে দুর্ঘটনার হারও তত কমবে।

পারিবারিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া

পারিবারিকভাবে শ্রমিক অশান্তিতে থাকলে কর্মস্থলেও তার একটা প্রভাব পড়ে। তাই শ্রমিকদের পারিবারিক সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। সম্ভব হলে আন্তঃপারিবারিক যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। যেমন : পিকনিক, খেলাধুলা, সচেতনতা ও মানসিকস্বাস্থ্য বিষয়ের ওপর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ক ভালো রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি

মানুষ তার জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় কর্মস্থলে কাটায়। এই সময়টিতে একটি বিশ্বাসের সম্পর্ক না থাকলে সারাক্ষণ এটি অস্বস্তি বা অস্থিরতা কাজ করতে পারে। মালিক-শ্রমিক, কর্মকর্তা-শ্রমিক এবং শ্রমিক-শ্রমিকের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে কর্মপরিবেশ ভালো থাকে। ফলে সবার মধ্যে একটি মানসিক শান্তি কাজ করে। এজন্য একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক-কর্মকর্তা-শ্রমিক সবার মধ্যে সম্পর্ক ও বিশ্বাস উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন : বিভিন্ন তথ্য পরিষ্কারভাবে শ্রমিকেরা যাতে জানতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে, কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকতে হবে, প্রতিশ্রুতিগুলো সময়মতো পূরণ করতে হবে ইত্যাদি।

জব সিকিউরিটি

বাংলাদেশের মানুষ বেতন কিছু কম হলেও একটি নিশ্চিন্ত চাকরি চায়। এর মানে হলো যখন তখন চাকরি চলে যাবে এই ভয় থেকে মুক্ত থাকতে চায়। শ্রমিকের মধ্যে যদি এইরকম ভয় থাকে তাহলে শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একাত্মতা অনুভব করতে পারে না। শৃঙ্খলার জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও অনার্থিক শাস্তি হতে পারে। তবে যখন তখন চাকরি চলে যাওয়ার ভয়টা শ্রমিকের মধ্যে না থাকাই ভালো।

Kachhi Biryani
Our mouth-watering kacchi cooked to perfection with fine Basmati rice will overwhelm you with the fragrance of tender mutton, roast potatoes and the mandatory Chicken Tandoori.
Home Delivery
01723-684 068
TraditionBd
Bangladeshi Traditional Food, Wedding Food & Breakfast
568, Block-C, Khilgaon, Taltola, Dhaka
Mobile: 01723-6840368, 01911-285088
www.facebook.com/tradition-bd

গবেষণা

মানসিক রোগ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা কর্মক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে

ডা. এস এম ইয়াসির আরাফাত
রেসিডেন্ট, এমডি (সাইকিয়াট্রি)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

দেহ, মন, কাজ, জীবন–আমাদের সার্বিক অবস্থার প্রতি মানসিক স্বাস্থ্য বা মানসিক রোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান। সেটা প্রদর্শন করে দিন দিন গবেষণার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। সর্বাধিক অক্ষমতার প্রথম দশটা রোগের মধ্যে পাঁচটিই মানসিক রোগ। কিন্তু আমাদের জীবনের বাস্তবতায় মানসিক রোগকে সবসময় হালকা করে ও কম গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ব্রিটেনে ১৫-৩০ ভাগ লোক তাদের কর্মক্ষম সময়ে মানসিক সমস্যায় পড়েন। ইউরোপের অন্যান্য দেশে সেটা প্রায় ২০ ভাগ বলে গবেষণায় পাওয়া যায়। মানসিক সমস্যা শুধুমাত্র ব্যক্তি পর্যায়ে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে তা নয়; সামগ্রিকভাবে শিল্প, সমাজ ও দেশের উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত করে।

পেশাগত বা কর্মক্ষেত্রে রোগের জন্য যে খরচ হয় তার মধ্যে মানসিক রোগ তৃতীয়। এর আগে আছে হাড্ডি-মাংস ও হার্টের রোগ। ইউরোপে মানসিক রোগের অক্ষমতার জন্য পেন্সিয়ানেরও ব্যবস্থা আছে। এই খরচ কয়েকভাবে বিবেচনা করা হয়। যেমন–চিকিৎসার জন্য 'সরাসরি-খরচ', রোগীর সেবা প্রদান, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ব্যস্ত থাকার জন্য 'পরোক্ষ-খরচ' এবং রোগে আক্রান্ত থাকার জন্য 'সুযোগ-খরচ'। অর্থাৎ রোগের জন্য যেসব আয় করার সুযোগকে ছাড় দিতে হয়েছে। উপরন্তু মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি শারীরিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তির তুলনায় বাড়তি কিছু অসুবিধায় পড়েন যেমন–লজ্জা, ভয়, তির্যক সামাজিক আচরণ।

কাজ, কাজের জায়গা, কাজের পরিবেশ আমাদের দেহ ও মনের ওপর প্রভাব ফেলে সার্বিকভাবে। আবার আমাদের দেহ ও মন কাজ, কাজের জায়গা ও কাজের পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুন্দর কাজের পরিবেশ একটি আরেকটির পরিপূরক। কাজের জায়গায় মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্বসহকারে দেখার জন্য গবেষণায় কয়েকটি মানদণ্ড বেরিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে সময়ের বাইরে অফিসে থাকতে বাধ্য না করা ছিল সবার আগে। কাজের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ কর্ম-পরিবেশকে আরামদায়ক করে। কাজ পরিবারের বাইরে আর একটা সামাজিক পরিচয় নির্মাণ করে। যে পরিচয়টি সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে সমুন্নত রাখতে পারলে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব রাখে এবং সর্বোপরি সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

কর্মক্ষেত্রে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ধারণা উল্লেখ করা হলো :

মানসিক রোগী মানেই বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী। কিন্তু বাস্তবে এটা ঠিক নয়। বুদ্ধি-প্রতিবন্ধিত্ব একপ্রকার মানসিক রোগ মাত্র যেটার প্রাদুর্ভাব সামগ্রিক মানসিক রোগের তুলনায় খুব অল্প।

মানসিক রোগ একবার হলে আর ভালো হয় না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মানসিক রোগ নিয়ে অনেক লোক উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত। আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা এই রোগের চলন, গঠন অনেক পরিবর্তন করেছে। হয়তো ভবিষ্যতে আরো করবে। প্রয়োজন হলো অতিসত্বর রোগ নিশ্চিত করা ও চিকিৎসা শুরু করা। সেই সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন যাতে একজন মানসিকভাবে আক্রান্ত ব্যক্তি তার সংকটময় মুহূর্ত কাটিয়ে আবার কাজে যোগ দিতে পারেন ও কাজ চালিয়ে নিতে পারেন।

মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি বা পূর্বে মানসিক রোগ ছিল এমন ব্যক্তিদের কর্মদক্ষতা কমিয়ে রেটিং করা হয়। কিন্তু বাস্তবে গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মালিক তাদের নিয়োগ দিয়েছিলেন তারা দেখেছেন স্বাভাবিক গড়পড়তা থেকে তাদের কাজের মান ভালো।

মানসিকভাবে অসুস্থ লোক কর্মক্ষেত্রে স্ট্রেস নিতে পারে না। বাস্তবে বলা হয়ে থাকে এটা একেবারেই সোজা-সাপটা বলা খুব কঠিন এবং গবেষণায় এরকম প্রত্যক্ষং সম্পর্ক পাওয়া যায়নি।

মানসিকভাবে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আগে থেকে অনুমান করা যায় না, তারা আক্রমণাত্মক হয় ও অন্যের ওপর চড়াও হয়। বাস্তবে এই মতকে সমর্থন করে কোনো গবেষণার ফলাফল পাওয়া যায়নি।

সূত্র : http://www.who.int/mental_health/media/en/712.pdf

আপনি মানসিকভাবে সুস্থ থাকার দায়িত্ব নিন, মনোবিকাশ আপনাকে সহযোগিতা করবে।
হতাশা
মানসিক চাপ
বিষন্নতা
কাজে অনীহা
দুশ্চিন্তা
নিদ্রাহীনতা
সামাজিক দক্ষতার অভাব
আত্মহত্যা প্রবণতা
সূঁচীবাই
অতিরিক্ত রাগ
মনোযৌন সমস্যা
অহেতুক ভয়
খিঁচুনী
দাম্পত্যকলহ
পরীক্ষা ভীতি
ক্ষুধামন্দা
মাদকাসক্তি
মনোচিকিৎসক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, সাইকোথেরাপীস্ট ও সাইকোসোস্যাল কাউন্সিলারের সম্মিলিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নানাবিধ মানসিক ও আচরনগত সমস্যা থেকে মুক্তি এবং মনোসামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মনোবিকাশ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহন করুন।
যেমন ঃ
মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রন
রাগ নিয়ন্ত্রন
সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি
রিলাক্সেশন টেকনিক
ফলপ্রসু যোগাযোগের কৌশল
নিজেকে জানা বা আত্ম আবিস্কার
কাউন্সিলিং এর মৌলিক দক্ষতা
প্যারেন্টিং সহ নানাবিধ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
যোগাযোগ
রুমঃ ৩৬-৩৯(২য় তলা) গ্রীনসুপার মার্কেট, গ্রীন রোড (ফার্মগেট), ঢাকা-১২১৫।
ফোন ঃ ০২৯১৩৬৪৬৯, ০১৬৭৫৫৫৮৩৩৯, ০১৮৩৭৭৩৩১০০
web: www.monobikash.com
e-mail : monobikash.bd@gmail.com
facebook : facebook.com/monobikashfoundation
চেম্বার : প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।
সাক্ষাতের জন্য পূর্বেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন
মনোবিকাশ ফাউন্ডেশন
মনোবিকাশ
সাইকোথেরাপি, কাউন্সেলিং ও ট্রেনিং সেন্টার

পুরনো স্মৃতি মনে করে মনকে ভালো রাখি

বাংলাদেশ রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি এবং এফবিসিসিআই-এর প্রাক্তন সহ-সভাপতি **আব্দুস সালাম মোর্শেদি**র প্রথম পরিচয় তিনি বাংলাদেশ ফুটবলের একজন প্রাক্তন তারকা ফুটবলার। একই সাথে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তা। মনের খবরের বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি ব্যক্তিগত জীবন, পেশাগত জীবন, পারিবারিক জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মুহাম্মদ এ মামুন**

কেমন আছেন?
আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি।

ভালো থাকার জন্য কী করেন?
ব্যবসার কাজে সময় দিই বেশি। সেই সাথে ফুটবলের উন্নয়নের ব্যস্ততা তো আছেই। খেলাধুলা নিয়ে যেমন ব্যস্ত থাকি তেমনি পরিবারকে সময় দেই, নিজের সুস্থতার জন্য নিয়মিত শরীর চর্চা করি ।

ব্যস্ততা কি আপনাকে ভালো থাকতে সাহায্য করে?
অবশ্যই। ব্যস্ততায় মাঝেই সফলতা।

বিরক্ত বোধ হয় না?
কিছুটা হয়। মানুষ মাত্রই তা হওয়ার কথা।

কখন বেশি হয়?
যথাসময়ে ব্যবসায় সময় না দিতে পারলে বিরক্ত বোধ হয়। সময়ের কাজ সময়ে না হলে বিরক্তি বোধ করি।

ব্যবসা বিষয়টিকে আপনি নিজে কীভাবে দেখেন?
ব্যবসা আমার পরিবারের পরিপূরক শব্দ। অবহেলা কিংবা সময় নষ্ট করলে ব্যবসা হয় না। এ ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। আমি সেটিই করি।

খেলা-ব্যবসা-পরিবার, কোনোটির সঙ্গে কোনোটির সংঘাত হয়?
দেখুন এই তিনটি বিষয়কেই আমি সমান প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আমার জীবনের প্রথম সফলতা হলো খেলা, খেলা থেকে ব্যবসায় সফলতা। আর পরিবার হলো প্রত্যেকটি মানুষেরই একটি মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন মানুষ চলতে পারে না, পরিবার ছাড়াও কেউ চলতে পারে না।

পরিবার-পারিবারিক পরিমণ্ডল উপভোগ করেন?
সময় পেলেই পরিবারকে সময় দেয়ার চেষ্টা করি। বিশেষ করে সবাইকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব করা, টিভি দেখা হয়। স্ব-পরিবারে বাইরে ঘুরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

নিজে ভালো থাকার উৎস কোনটি?
নিজে ভালো থাকার মূল উৎস হচ্ছে অহংকার না করা। আমি মনে করি সাধ্যের মধ্যে সবাইকে নিয়ে খুশি থাকলেই ভালো থাকা যায়।

মন খারাপ হয়? সামলান কীভাবে?
হ্যাঁ। মাঝে মধ্যে গান শুনি। পুরনো স্মৃতি মনে করে মনকে ভালো রাখি। সময় বাড়িয়ে দিই পরিবারকে।

রাগ থাকা কতটুকু দরকার?
প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আবেগ-অনুভূতি, রাগ থাকা ভালো। তবে প্রয়োজনের বাইরে রাগ থাকা ভালো নয়।

এখন তো খেলার জায়গা নেই। বিষয়টি

আমাদের দেশেও অনেক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সুস্থতা এবং কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ টিম রয়েছে। তবে সেটা উন্নত বিশ্বের চেয়ে অপ্রতুল তা বলতে পারেন। এ ব্যাপারে সরকারিভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনা ভালো কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন যা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন হবে।

শিশুদের বিকাশে কতটা বিঘ্ন ঘটাচ্ছে?

খেলার জায়গা আছে, তবে প্রয়োজন অনুসারে সীমিত। একটি শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলার খুবই প্রয়োজন।

উন্নত বিশ্বের অনেক জায়গায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সুস্থতা এবং কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ টিম থাকে, আমাদের দেশে কি এমন কিছু আছে? বা কোনো পরিকল্পনা কি আছে?

আমাদের দেশেও অনেক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সুস্থতা এবং কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ টিম রয়েছে। তবে সেটা উন্নত বিশ্বের চেয়ে অপ্রতুল তা বলতে পারেন। এ ব্যাপারে সরকারিভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনা ভালো কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন যা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন হবে। সেই সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে পোশাক খাতের একজন উদ্যোক্তা হিসেবে বলছি, এই খাতে কর্মীদের সুস্থতা ও কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট উদ্যোগ আছে।

খেলা কিংবা ব্যবসা দু-দিকেই মানসিক দিকটি উপেক্ষিত। সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে উৎপাদন ক্ষমতা এবং কর্মক্ষমতা দু-ক্ষেত্রেই বাড়বে–আপনি কীভাবে ভাবেন?

মানুষের জীবনে কর্মব্যস্ততা যেমন দরকার, তেমিন কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নেয়াটাও জরুরি। শরীর-মনকে চাঙ্গা রাখতে মাঝে মধ্যে সব কর্মব্যস্ততা দূরে ঠেলে দিয়ে বিশ্রাম নেয়া উচিত।

রাতে যখন ঘুমান, তখন কতটুকু প্রশান্তি আসে?

অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করে বিছানায় গেলে ঘুম ভালো আসে।

ভবিষ্যতে আর কী স্বপ্ন দেখেন?

আমার ভবিষ্যত স্বপ্ন একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে আমার যা করণীয় সবই আমি সাধ্যমত করে যাব।

মনের খবরের পাঠক শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিষয়ে কিছু বলবেন?

বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। বিশ্ব দরবারে আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। আসুন সবাই মিলে এই দেশকে আরো বহুদূর এগিয়ে নিই।

আপনার সন্তানকে নেশার হাত থেকে বাচাঁন!

প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজসেবীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ১০০ শয্যাবিশিষ্ট দেশের প্রথম এবং একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক মানসিক ও মাদকাসক্তি সমস্যার চিকিৎসা কেন্দ্র "মুক্তি" মানসিক ও মাদকাসক্তি সমস্যাগ্রস্থদের সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতায় আন্তর্জাতিক মানের "মুক্তি" ই পারে আপনাকে/আপনার সন্তানকে মানসিক ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সাহায্য করতে।

মাদকাসক্তির লক্ষণ সমূহ ঃ

- হঠাৎ নতুন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে চলাফেরা আরম্ভ করা।
- বিভিন্ন অজুহাতে ঘনঘন টাকা চাওয়া।
- ক্রমান্বয়ে বিলম্বে বাড়িতে ফেরৎ আসা।
- পেঁচার মত দিনে ঘুম ও রাতে জেগে থাকার প্রবণতা।
- ঘুম থেকে জাগার পর অস্বাভাবিক আচরণ করা।
- খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেওয়া এবং ওজন কমতে থাকা।
- অতিরিক্ত মাত্রায় মিষ্টি খেতে আরম্ভ করা ও ঘনঘন চা, সিগারেট পান করা।
- বই/পত্রিকা/ম্যাগজিন পড়ার বাহানায় দীর্ঘ সময় টয়লেটে কাটানো।
- অকারনে বিরক্ত হতে আরম্ভ করা এবং মন-মানসিকতায় আকস্মিক মারাত্মক পরিবর্তন দেখা দেয়।
- কামরায় সিগারেটের তামাক আলগা পড়ে থাকতে অথবা প্লাষ্টিকের ছোট বোতল, কাগজের পুরিয়া, ইনজেক্শনের খালি শিশি, পোড়ানো দিয়াশলাই-এর কাঠি ইত্যাদি ঘনঘন পাওয়া যায়।
- লেখাপড়া খেলাধূলাসহ স্বাভাবিক কাজকর্মে আগ্রহ হীনতা, প্রচুর ঘাম হওয়া, অস্থিরতা ও অস্বস্থি বোধ করা।
- কোষ্ঠ কাঠিন্যে ভোগা অথবা ঘনঘন পাতলা পায়খানা হওয়া, যৌন ক্রিয়ার অনিহা ও যৌন ক্ষমতা হ্রাস।
- মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা, পরিবারের সদস্যদের সাথে গরমিল।
- এরূপ এক বা একাধিক ঘটনা ঘটলে আপনার সন্তানকে মাদকাসক্তি থেকে রক্ষা করে তার জীবন বাঁচাতে পারেন। সজাগ ও সতর্ক থাকলে আপনি আপনার সন্তানকে মাদকাসক্তি থেকে রক্ষা করে তার জীবন বাঁচাতে পারেন। সময়মত সুচিকিৎসা আপনার সন্তানের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন।

সুপ্রতিষ্ঠিত ও দেশের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ড্রোপ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী **Toxi-Lab** - এর সাহায্যে ইউরিন ড্রোপ টেষ্ট এর মাধ্যমে মাদকাসক্তি নিরূপন করা হয়।

মাদকাসক্তি সমস্যা?

- হেরোইন
- পেথিডিন
- ফেনসিডিল
- মদ, গাজা
- ইয়াবা

তাই অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন ।

মানসিক ও মাদকাসক্তি বিষয়ক উপদেশ ও পরামর্শের জন্য

ড্রাগ হেল্প লাইন ঃ ২৪ ঘন্টা খোলা-

9896165, 9847147, 58814562, 01678 244511-7

আসুন আমরা মাদকাসক্তদের চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করি এবং পরিবার ও সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনি ।

MUKTI + মুক্তি +

মানসিক এন্ড মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র লিঃ

আন্তর্জাতিক মানের একমাত্র মুক্তি হাসপাতালেই রয়েছে সার্বক্ষণিক নিজস্ব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

স্থাপিত ঃ ১৯৮৮ইং

বাড়ি-২, রোড-৪৯, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ, ফোন: ৯৮৪৭১৪৭, ৫৮৮১৪৫৬২, ৯৮৯৬১৬৫, ৯৮৮৩৯৯১

মোবাইলঃ ০১৬৭৮ ২৪৪৫১১-৭,০১৭১১৬৩৩৭৯২,০১৫৫২৪৪৩৮৪৯

web: www.muktidrughelpline.com, Facebook: Mukti Drug Helpline Ltd

ছবি : কাকলী প্রধান

মা-সন্তানের সম্পর্ক

বিজ্ঞান কী বলে?

ডা. সালাহ্উদ্দিন কাউসার বিপ্লব
অধ্যাপক, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মা এবং সন্তানের সম্পর্কই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর, স্বাভাবিক, স্থিতিশীল এবং গভীরতম সম্পর্ক, সন্দেহ নেই। মায়ের স্তনে শিশুর মুখ, মা পাখির ঠোঁটে শিশু-পাখিটির ঠোঁট, মা বানরের পিঠে চড়া শিশু-বানর, ক্যাঙারুর পেটের থলিতে আটকে থাকা শিশুটির ছবি কিংবা মা কুমিরের মুখের ভেতর নিরাপদে থাকা কুমির-ছানাগুলোর কথা ভাবলে এই সম্পর্কের শক্তির কথা স্বীকার করতে কার সন্দেহ হতে পারে!

সন্তানের সাথে মা আর মায়ের সাথে সন্তানের এই সম্পর্কের তীব্র যে প্রভাব পরস্পরের ওপর পড়ে, পৃথিবীতে আর কোনো সম্পর্কের ভেতর সেটা ভাবাও যায় না। সাধারণ দৃষ্টি দিয়েই এই সম্পর্কটিকে অনুভব করা যায়। তবুও এই সম্পর্কের পেছনের শক্তিকে আবিষ্কার করতে আজ অব্দি গবেষণাও কম হয়নি। জিনগত ব্যাখ্যা, বায়োলজিক্যাল বা শারীরিক ব্যাখ্যা, সামাজিক ব্যাখ্যা, মানসিক বা সাইকোলজিক্যাল ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন রকমের যুক্তি বা ব্যাখ্যাও মা-সন্তানের এ-সম্পর্কটির বিষয়ে সাধারণ ধারণাটিকেই বারবার প্রমাণ করেছে, আরো স্পষ্ট করেছে, আরো জোরালো করেছে। একজন মা তার সন্তানের গায়ের গন্ধ দিয়েই অনুভব করতে পারেন তার সন্তানের অস্তিত্ব। পশুদের ভেতর এর তীব্রতা আরো বেশি এবং স্পষ্ট হয়ে থাকে। মজার বিষয় হলো, এই খেলায় শিশুটিও কম যায় না। জন্মের অতি অল্প সময়ের ভেতর শিশুটিও মায়ের গন্ধটি বুঝে যায়। স্তন পান করা শিশুটির কাছে বিষয়গুলি আরো স্পষ্ট। তারা এমনকি মায়ের একটি স্তন থেকে অন্য স্তনকে আলাদা করতে পারে। অনেক গবেষক বলেছেন, এই গন্ধের অনুভবটি গর্ভে থাকা অবস্থায়ই শুরু হয়। গবেষকগণ এর একটি নামও দিয়েছেন, ফ্যারোমোন্স (Pheromones)। এই ফ্যারোমোন্স বা গন্ধবিজ্ঞানের কীর্তিকলাপ আরো বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অনুমান করা হয় গন্ধ বিষয়টিই মা ও সন্তানের সম্পর্কের মূল শেকড় বা প্রাথমিক ভিত্তি। মা-শিশুর এই গন্ধ-গন্ধ রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরস্পরকে, বিশেষ করে শিশুটিকে নিরাপত্তার অনুভব দেয়। অর্থাৎ গন্ধ পাওয়ার সাথে সাথে শিশুটি বুঝতে পারে, তার খাদ্য থেকে শুরু করে সমস্ত অনিশ্চিত বিষয়গুলো এখন নিশ্চিত। কান্নারত শিশুটি কান্না থামিয়ে দেয়, ভীত সন্তস্ত্র ভাবটি নিমিষেই উধাও হয়ে যায়। নিরাপত্তার এই অনুভূতি প্রতিটি সন্তানকে মা-ই শেখান, মা-ই দেন এবং মা-ই দিতে পারেন।

বিশ্ব মা দিবস বা মা দিবস। বহুদিন, বা বহুবছর ধরেই এ দিবসটি পৃথিবীতে বিভিন্নভাবে পালিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী কিংবা ধর্মীও গোষ্ঠীতেও এই দিবস পালনের রীতি আছে। মাকে অনুভব করা, মা-শিশুর সম্পর্ককে অনুভব করা, সর্বোপরি মায়ের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করার জন্যই এ দিবসটি পালন করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দিবসটি ভিন্ন ভিন্ন দিনে পালন করা হয়। এমনকি একই দেশে বছরে বছরে তারিখ পরিবর্তনও হয়। আমাদের দেশে দিবসটি পালন করা হয়, প্রতিবছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার (এ বছর ১৩ মে)। দিবসটির আধুনিক প্রবক্তা হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যানা জার্ভিস। তিনি তাঁর মায়ের প্রতি সম্মান জানাতেই এই দিবসটি পালনের কথা ভাবতে শুরু করেন। তাঁর মা অ্যানা মেরি রিভস্ জার্ভিস জীবনভর অনাথ ও আতুর মানুষের সেবা করেছেন। যা তিনি করেছেন একান্তে ও গোপনে। সেই মা মারা যান ১৯০৫ সালে। পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমন অসংখ্য মায়েদের প্রতি সম্মান জানাতেই এ দিবসটির কথা ভাবতে শুরু করেন অ্যানা জার্ভিস। সাত বছর পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার দিবসটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবেই স্বীকৃতি দেন। 'মা' অতি সাধারণ, সহজ-সরল ছোট্ট একটি শব্দ। যে শব্দের উচ্চারণেও কোনো জটিলতা নেই। অনুভবেও কোনো অস্পষ্টতা নেই। পৃথিবীর যে-কোনো জাতির, যে-কোনো দেশের, যে-কোনো গোষ্ঠীর সকল সন্তানের নিরাপত্তার প্রথম অনুভূতি–মা। আমার মতে, মা হলো পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসার প্রাথমিক উৎস।

মায়েরা কিছুটা স্বার্থপরও হয়ে থাকেন। নিজের সন্তানের প্রতি ভালোবাসা তারা আর কোনো কিছুতেই ভাগ হতে দিতে চান না। জগতের সকল সন্তানই মায়ের কাছে সন্তান, তবুও কোথায় যেন তারা নিজের নাড়ি-ছেঁড়া ধনের প্রতি আলাদা একটা টান অনুভব করেন। এই টান অনুভবে বাবারাও কম নন। কোথাও কোথাও হয়তো বাবাদের অনুভব আরো বেশিও দেখা যায়। সন্তানটির জিনগত গঠনেও বাবার অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা সন্তানের অনুভব তৈরির ক্ষেত্রে বাবার চেয়ে মায়ের আবেগের দিকটিকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। তারা বলছে, সন্তানের আবেগ তৈরির ক্ষেত্রে বাবার চেয়ে মায়ের আবেগই বেশি অবদান রাখে। হয়তো সত্যি, হয়তো না! না, আমি গবেষণালব্ধ এসব ফলের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছি না। বরং মায়ের অবদান বা অবস্থানের প্রতি আরো একটু বেশি যুক্তি খোঁজা যায় কিনা সে চেষ্টা করছি। প্রতিটি মানব সন্তান, মায়ের পেটে যখন ভ্রূণ হিসেবে কিংবা একখণ্ড ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড হিসেবে যাত্রা শুরু করে, তখন তাদের নিজস্ব কোনো পরিচয় পর্যন্ত থাকে না। ছেলে না মেয়ে সে বিষয়টিও তখন প্রকাশ পায় না। ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডটি মায়ের জঠরের ভেতর, মায়ের শরীরের অংশ হিসেবেই বাড়তে থাকে। মায়ের রক্ত, মায়ের মাংস, অক্সিজেনসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু মায়ের শরীর থেকে সরাসরি নিয়েই মাংসপিণ্ডটি বড় হয়। সপ্তাহখানেক পর, ধীরে ধীরে আলাদা হতে শুরু করে। ছেলে কিংবা মেয়ে, তার নিজস্ব পরিচয়ের দিকে এগোতে থাকে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখা ভালো, মেয়ে হলে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা, অর্থাৎ পূর্বের গতিপথ ধরেই এগোয়। ছেলে হলে অর্থাৎ 'Y' ক্রোমোজোম থাকার কারণে ধীরে ধীরে গতি পরিবর্তিত হয়। উভয়ক্ষেত্রেই

মায়ের সাথে সুন্দর স্বাভাবিক সম্পর্কটি মানুষকে শৈশব-কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্য কিংবা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত প্রচণ্ড এক মানসিক শক্তি দিয়ে থাকে। যার নাম নিরাপত্তা, নিরাপত্তা-বোধ। মা-ও সন্তানের যে-কোনো ধরনের নিরাপত্তাহীনতাকে অনুভব করতে পারেন। সন্তানের যে-কোনো বিপদে নাকি মায়ের মনে 'কু-ডাক' দিয়ে ওঠে, মায়ের হাত থেকে থালা পড়ে যায়, মায়ের বুক কেঁপে ওঠে–এমন অনেক গল্প কিংবা বিশ্বাস আমাদের সমাজে সবখানেই চালু আছে।

মাংসপিণ্ডটি মায়ের পেটে বিভিন্ন পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে এক সময় একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপ নেয়। এটাই সব মানুষের জন্মের সাধারণ হিসেব। আমি কিংবা আপনি সবার ক্ষেত্রেই একই হিসেব, একই কাহিনি। প্রতিটি মানুষকেই সরাসরি মায়ের শরীরের অংশ হিসেবে জীবনের যাত্রা শুরু করতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পর মায়ের শরীর থেকে আলাদা হতে হয়। সন্তান ভূমিষ্ট হয়, পৃথিবীতে আসে। তৈরি হয় দুটি মানুষের দুটি আলাদা পরিচয়–মা ও শিশু।

সে মা সন্তানের নিরাপত্তার কেন্দ্রবিন্দু হবে না, তাহলে কে হবে! মনোবিজ্ঞানের ভাষায় আরো একটি শব্দ আছে, 'এটাচমেন্ট'। শিশুসন্তান জন্মের পর সাধারণত তারা কোনো একজনের ওপর নির্ভর করে। এই নির্ভরতার বিষয়টিকেই বলে এটাচমেন্ট। আর নির্ভর করা মানুষটিকে বলে 'এটাচমেন্ট ফিগার'–যার সাথে বা যার সান্নিধ্যে শিশুটি সব ধরনের নিরাপত্তা অনুভব করে। পূর্বের আলোচনা থেকেই এটি স্পষ্ট যে, সাধারণত এই এটাচমেন্ট ফিগারটিই হয়ে থাকেন মা। কখনো কখনো মা ছাড়া অন্য কেউও হতে পারেন। যেমন : যেসব ক্ষেত্রে মা থাকেন না বা মায়ের নিজের অবস্থা নিরাপদ থাকে না সেসব ক্ষেত্রে অন্য কেউ এই ভূমিকায় থাকতে পারেন। এই এটাচমেন্ট তৈরি হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। যেসব শিশুদের ক্ষেত্রে এটাচমেন্ট বিষয়টি তৈরি হয় না বা কোনো কারণে বিঘ্নিত হয়, তাদের শিশুকাল থেকেই এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার অনুভব তৈরি হয়। যা তাদেরকে এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বয়ে বেড়াতে হতে পারে। অপরদিকে, মায়ের সাথে সুন্দর স্বাভাবিক সম্পর্কটি মানুষকে শৈশব-কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্য কিংবা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত প্রচণ্ড এক মানসিক শক্তি দিয়ে থাকে। যার নাম নিরাপত্তা, নিরাপত্তা-বোধ। মা-ও সন্তানের যে-কোনো ধরনের নিরাপত্তাহীনতাকে অনুভব করতে পারেন। সন্তানের যে-কোনো বিপদে নাকি মায়ের মনে 'কু-ডাক' দিয়ে ওঠে, মায়ের হাত থেকে থালা পড়ে যায়, মায়ের বুক কেঁপে ওঠে–এমন অনেক গল্প কিংবা বিশ্বাস আমাদের সমাজে সবখানেই চালু আছে। সন্তানের যে-কোনো সাফল্যেও নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি খুশি হওয়ার মানুষ কেউ থাকে না।

পৃথিবীতে কত গান, কত কবিতা, কত নাটক-সিনেমা নির্মাণ হয়েছে মা আর সন্তানের সম্পর্ককে ভিত্তি করে, সেকথা হিসেব করে শেষ করা যাবে না। ধর্ম কিংবা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা সাহিত্য কোথাও এর ব্যত্যয় দেখা যায়নি। 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত', 'মায়ের মতো আপন কেহ নাইরে...' এমন হাজারো উপমা, লাইন, উক্তি প্রতিনিয়ত তৈরি হয় পৃথিবীতে মাকে নিয়ে। ডিয়াগো ম্যারাডোনা তাঁর মাকে নিয়ে বলেছেন, 'আমার মা মনে করেন আমিই সেরা, আর আমার মা মনে করেন বলেই আমি সেরা হয়ে গড়ে উঠেছি।' মায়ের অবদান, মায়ের অবস্থান, মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা মানে নিজের জীবনকেই ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলা।

বিশ্ব মা দিবসের প্রয়োজন কতটুকু জানি না। মাকে স্মরণ করতে কিংবা মায়ের প্রতি সম্মান দেখাতে আলাদা কোনো আড়ম্বরের প্রয়োজন আছে কিনা সেটিও একটি প্রশ্ন! মায়ের পেটে ভ্রূণ হিসেবে যাত্রা শুরু করার পর থেকে জীবনের যে-কোনো সময়ে বা যে-কোনো প্রয়োজনে মায়ের চেয়ে ধারালো, শানানো তলোয়ার বা হাতিয়ার সন্তানের জন্য আর কে হতে পারে? ফ্রয়েড মানুষের সামনে চলার বিষয়গুলোকে 'ড্রাইভ' শব্দ দিয়ে বর্ণনা করছেন। সেই ড্রাইভের ব্যাখ্যার জন্য দুটি শব্দও তিনি রেখেছেন। একটি 'এরোস' অন্যটি 'থ্যানোস'। এরোস মানে পাওয়ার জন্য–নিজের জন্য, আনন্দের জন্য ড্রাইভ। আর 'থ্যানোস' মানে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করা। মায়েরা সন্তানের জন্য সেই 'থ্যানোস' গ্রুপে অবস্থান করেন। সেই সন্তান যদি মাকে যথাযথ সম্মান না দিতে পারে, তাহলে তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কী হতে পারে!

সবশেষে বিখ্যাত অভিনেত্রী সোফিয়া লরেনের একটি উক্তি উল্লেখ করছি, 'কোনো একটি বিষয় মায়েদেরকে দুইবার ভাবতে হয়, একবার নিজের জন্য একবার তার সন্তানের জন্য।'

সারা পৃথিবীর কোনো মা-ই যেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অনিরাপদ অনুভব না করেন, অনিশ্চিত না থাকেন। ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সমাজ কিংবা পরিবার সবার কাছে এমন প্রত্যাশাই থাকবে।

বিশ্ব মা দিবসে বিশ্বের সকল মায়ের জন্য ভালোবাসা।

TÜV AUSTRIA
ISO 9001 : 2008

PROTTOY MEDICAL CLINIC LTD.

Psychiatry & De-addiction Hospital

Prottoy is the leading psychiatric, drug and alcohol rehabilitation facility in Bangladesh. Since 2002, we have treated over 7000 patients for drug and alcohol abuse, psychiatric illness and depression. Our patient recovery rate for drug and alcohol addiction is highest. (the worldwide recovery rate is less than 10%). Our psychiatrists have more than 40 years of experience in rehabilitation and psychiatric treatment. All patients experience an acclaimed life-management program to recover a healthy routine.

OUR SERVICES

Treatment for Drugs & Alcohol Addiction

Life Management Program

Our program is individually tailored to meet the needs of the patient so that he/she may move forward to lead a happy and sober life

Intense counselling and therapy both to the patient and the family on a regular basis

Integration with support group for continued assistance after the completion of the program

Activities such as outdoor sports and trips to Bangkok and Cox's Bazar to understand the importance of sober fun.

Drug and Alcohol Detoxification

Detoxification from drugs and alcohol in a comfortable and medically supervised setting.

Psychiatric and Psychological treatment

Psychiatric and psychological issues are addressed by our team of doctors and psychologists on a case by case basis

Family counselling services to the patient as well so he/she may re-adjust to family life and society easily

Outdoor patients counseling

Counselling services are offered to married couples so that they can resolve their family issues and improve their communication with each other.

Drug Screening Test

24x7 HELPLINE

019 47 400 400

CLINIC & OFFICE : HOUSE # 13, ROAD # 5, BLOCK # J, BARIDHARA R/A, DHAKA 1212

TEL : +88-02-9858088, 9854403 **email** : info@prottoymedical.com

www.prottoymedical.com

ছবি : **কাকলী প্রধান**

অকুপেশনাল থেরাপি

মানসিক রোগীর সীমাবদ্ধতা অতিম, স্বনির্ভর জীবন-যাপনে সাহায্য করে

রাবেয়া ফেরদৌস
অকুপেশনাল থেরাপিস্ট
ফিজিক্যাল মেডিসিন ও
রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব
নিউরোসাইন্সেস ও হাসপাতাল
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।

মানুষের শরীর ও মন একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শরীর ভালো থাকলে মন ভালো থাকে আবার মন ভালো থাকলে শরীর ভালো থাকে। তাই সুস্থতার জন্য শরীরের যত্ন নেয়ার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।
এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাপ্তবয়স্ক বাংলাদেশিদের শতকরা ১৬ ভাগ এবং শিশুদের মধ্যে শতকরা ১৮ ভাগ শিশু মানসিক সমস্যায় ভুগছে।
এই বিশাল জনগোষ্ঠী কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেমন দৈনন্দিন কাজ করতে সমস্যা, সামাজিক দক্ষতা বিকাশে সমস্যা, মনোযোগের অভাব, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া ইত্যাদিতে আক্রান্ত। এই সকল সমস্যার সমাধান নিয়ে বিভিন্ন প্রকার থেরাপিউটিক টেকনিক ব্যবহারের মাধ্যমে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট রোগীর সঙ্গে কাজ করে থাকেন।
অকুপেশনাল থেরাপি একটি স্বাস্থ্যসেবামূলক পেশা, যেটি একজন মানুষের বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আরো বেশি স্বনির্ভর জীবনযাপন করতে সাহায্য

যে সকল রোগীর মানসিক সমস্যার কারণে মনোযোগ, কোনো সমস্যার সমাধান করা, গুছিয়ে কাজ করা এবং সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিকতা পালনের সমস্যা থাকে তাদের বিভিন্ন একটিভিটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য অকুপেশনাল থেরাপিস্ট বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

করে। একজন ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতা, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার কারণে অনেক রকম সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। অকুপেশনাল থেরাপির প্রধান উদ্দেশ্য হলো–সর্বাধিক দক্ষতা অর্জন করে পেশাগত উন্নতি করতে এবং জীবনের মান উন্নত করতে সাহায্য করা। বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের ক্ষেত্রে অকুপেশনাল থেরাপিস্টরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে থাকেন। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে–

- দুশ্চিন্তা বা অবসাদ
- হতাশা
- মানসিক চাপ
- নিদ্রাহীনতা
- শুচিবাই
- মাদকাসক্তি এবং
- কাজে অনিহাসহ অন্যান্য মানসিক রোগ।

অকুপেশনাল থেরাপির মূল লক্ষ্য হচ্ছে একজন ব্যক্তির সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে তাকে দৈনন্দিন কার্যকলাপের সকল দিকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা। যেমন :

- ব্যক্তিগত কাজে স্বাবলম্বিতা
- কর্মক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতা
- সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী
- বিনোদনমূলক বা অবসর কার্যকলাপে অংশগ্রহণ
- পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

একজন মানসিক রোগীর জন্য অকুপেশনাল থেরাপি বিশেষভাবে প্রয়োজন। এর কারণগুলো হলো : অকুপেশনাল থেরাপিস্টগণ মানসিক রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে অন্যান্য হেলথ প্রফেশনালদের সঙ্গে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমে থাকেন।

এ রোগীদের ঔষধ খাওয়ার মাধ্যমে সুস্থ হবার পাশাপাশি সমাজে পুনরায় ফিরে যাওয়া এবং সুস্থ ও সঠিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য অকুপেশনাল থেরাপিস্টগণ কাজ করে থাকেন।

পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, পেশাগত বা বিনোদনমূলক কাজকর্মে রোগীদের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে তাদের মাঝে উচ্ছৃঙ্খল ও আক্রমণাত্মক আচরণ দূর করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে রোগীকে তার পেশাগত ও বিনোদনমূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করানোর জন্য একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঔষধের পাশাপাশি রোগীদের বিভিন্ন গ্রুপ একটিভিটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের যে-সকল সামাজিক দক্ষতাসমূহের সমস্যা আছে সেগুলোর উন্নয়নের জন্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা সম্পর্কে ট্রেনিং দেবার জন্য একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। দৈনন্দিন কাজকর্ম, যেমন : নিজের খাওয়া, গোসল করা, জামা কাপড় পরা, ব্রাশ করা, খেলাধুলা করা–এ কাজগুলো অনুশীলন করার মাধ্যমে যথাসম্ভব মানসিক রোগীদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতে এবং পুনরায় তাদের কাজে ফিরিয়ে নেবার জন্য একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট দরকার।

একজন মানুষ যখন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার স্বাভাবিক জীবনের কাজকর্ম যেমন : খাওয়া, কাপড় পরা, গোসল করা ইত্যাদি করার মতো সামর্থ্য থাকে না, তখন সেই কাজটিকে অনেক কঠিন মনে হতে পারে কিংবা করতে সে ভয় পেতে পারে। এরকম পরিস্থিতিতে একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট পারেন রোগীর কাজটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে অভ্যাসের মাধ্যমে এবং কাজটিকে আনন্দময় করে তাকে তা করতে অভ্যস্ত করে তুলতে।

যে সকল রোগীর মানসিক সমস্যার কারণে মনোযোগ, কোনো সমস্যার সমাধান করা, গুছিয়ে কাজ করা এবং সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিকতা পালনের সমস্যা থাকে তাদের বিভিন্ন একটিভিটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য অকুপেশনাল থেরাপিস্ট বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট রোগীদের একটি রুটিনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজকর্মে অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করেন।

উল্লেখ্য যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানসিক হাসপাতালগুলোতে দক্ষ অকুপেশনাল থেরাপিস্টগণ যত্নসহকারে মানসিক রোগীর চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। অথচ বাংলাদেশের সরকারি মানসিক হাসপাতালগুলোতে সরকারিভাবে অকুপেশনাল থেরাপিস্টের পদ থাকলেও সেখানে কোনো অকুপেশনাল থেরাপিস্ট নেই। ২০১৪ সালে সিআরপি ও মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের যৌথ প্রজেক্টে অকুপেশনাল থেরাপিস্টরা কাজ করে যাচ্ছেন। রোগীর প্রয়োজনের তুলনায় যা যথেষ্ট নয়। তাই সরকারিভাবে পর্যাপ্ত অকুপেশনাল থেরাপিস্ট নিয়োগের ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দৃষ্টি দেয়া একান্ত আবশ্যক।

পরোক্ষ ধূমপান

ক্যান্সার, হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়

ডা. মুনতাসির মারুফ
সহকারী অধ্যাপক
মনোরোগবিদ্যা বিভাগ
ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদফতর, ঢাকা।

হঠাৎ করেই বিশ্রী গন্ধটা নাকে লাগে, ঝট করে যেন মগজের ভেতরটা পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়। এই গন্ধটা সহ্যই করতে পারি না কখনো। মাথা দপ দপ করতে থাকে, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। উঠে দাঁড়িয়ে দেখি সামনের দুই সারি আগে বসা এক ভদ্রলোক (!) সিগারেট ধরিয়েছেন। গলার আওয়াজটা একটু উঁচু করেই বলি, 'এই যে ভাই সিগারেট ধরালেন যে!'

'তো?' নির্বিকার ভঙ্গিতে উল্টো প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক।

'ট্রেনে সিগারেট ধরানো নিষেধ, এইটা আপনি জানেন না?'

লোকটি মুচকি হাসে, জবাব দেয় না, সিগারেট ধরা হাতটা কেবল কিছুটা জানালার দিকে এগিয়ে রাখে।

মেজাজ চড়ে যায়। 'দেখেন না কী লেখা আছে?' বলে 'প্রকাশ্যে ধূমপান আইনত দণ্ডনীয়' লেখাটা তাকে দেখিয়ে দিই–'আপনারা দেখি আইনও মানতে চান না। এখন পুলিশ ডেকে আনি, জরিমানা করে দেবে আপনাকে?'

লোকটি এবার বিরক্তি প্রকাশ করে–'কী শুরু করলেন ভাই? এই দেশে কে কয়টা আইন মানে? আপনি নিজেই কয়টা মানেন? ট্রেনের কারোরই কোনো সমস্যা হইতেছে না, খালি আপনেই চিল্লাফাল্লা করতেছেন। অসুবিধা হইলে আমি সিগারেট শেষ করা পর্যন্ত আপনি একটু ঘুইরা আসেন।'

চরম ক্রোধে আমি বাক্য হারিয়ে ফেলি। সাহায্যের আশায় আশপাশে তাকাই। অধিকাংশ যাত্রীই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। দুই-একজন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, কারো মুখে মুচকি হাসি, কিন্তু এই বচসায় অংশগ্রহণের তেমন ইচ্ছে কারো নেই।

অনির্দিষ্টভাবে বলি–'দেখছেন, কীরকম ব্যবহার করতেছেন উনি। অপরাধ করবে, আবার বললেও দোষ!'

প্রতিক্রিয়া দেখালেন তিন সারি সামনে বসা আরেক ভদ্রলোক। আমার দিকে তাচ্ছিল্যের একটা চাহনি দিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে কামরার ভেতরেই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শান্ত গলায় বললেন–'বসেন ভাই বসেন। অযথা কথা খরচ কইরা কী লাভ?'
আমি চুপচাপ বসে পড়লাম।

২
নাকটা কুঁচকে উঠলো বিশ্রী কড়া ধরনের গন্ধে। সামনের সিটে বসা লুঙ্গি-শার্ট পরা যাত্রীটির হাতে সিগারেট। নাহ্ সিগারেট না বোধহয়, যে কড়া গন্ধ–এটাকেই বোধ হয় বিড়ি বলে। মেজাজ খারাপ হলো–'কী ভাই, বাসের মধ্যে সিগারেট ধরাইছেন কেন?' লোকটি কোনো জবাব দেয় না।
'সিগারেট ফেলেন।' আদেশের সুরে বলি।
লোকটি এবার তেড়ে উঠে–'টাকা দিয়া টিকিট কিনি নাই? আপনের কথামতন চলুম!'
–আরে, তাই বলে বাসে বিড়ি ধরাবেন? অন্য যাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে না?
–কার সমস্যা হইতেছে?
–আমার সমস্যা হচ্ছে।
–বাস আপনের বাপের? অসুবিধা হইলে নিজে বাস কিনা একা বইসা যান।
এই লোকের সঙ্গে কথায় পারা আমার পক্ষে সম্ভব না। সাহায্যের জন্য সামনের দিকে তাকাই। কিন্তু সাহায্য করবে কে? যার দিকে তাকাই, সেই ড্রাইভারের এক হাত স্টিয়ারিংয়ে, অপর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। পাশে তাকিয়ে দেখি, বাসের দরজা ঘেঁষে দাঁড়ানো হেলপারের ঠোঁটেও ধূম্র-শলাকা।

৩
চারদিকে রোগীর ভিড়। এর মাঝ দিয়েও গন্ধটা ঠিকই জানান দেয় তার অস্তিত্ব। সামনে থেকে রোগীদের সরে যেতে বলি। দু-তিনজন সরে গিয়ে যেটুকু জায়গা করে দেন, সেটুকু ফাঁক দিয়েই দেখি, দরজার ঠিক বাইরেই সিগারেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক।
'এই, হাসপাতালের ভেতরে সিগারেট খায় কে?' বলে চেঁচিয়ে উঠি।
চেঁচানোতে লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকায়। যখন বুঝতে পারে, তাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছি, দরজা থেকে কিছুটা সরে দাঁড়ান। কিন্তু সিগারেট ফেলেন না হাত থেকে। মেজাজ খিঁচড়ে যায়। চেয়ার থেকে উঠে বাইরে আসি–'কী ব্যাপার, এইখানে সিগারেট খাইতেছেন কেন?'
গাট্টাগোট্টা ধরনের লোকটা এবার উল্টো জিজ্ঞেস করে–'নতুন আইছেন? বাড়ি কই?'
এবার আমার রাগে প্রায় দিশেহারা হওয়ার অবস্থা। কথা আটকে যায়। 'হাসপাতাল থেকে বেরোন।' নির্দেশের সুরে বলি।
'যামু না, আপনে আমারে বাইর করার কে?' নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেটে টান দিয়েই যান তিনি।
এরই মধ্যে হৈচৈ শুনে হাসপাতালের দু-তিনজন কর্মচারী ওখানে আসে। দুজন ঐ লোকটিকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমাকে বলে–'স্যার আপনে যান, আমরা দেখতেছি।' লোকটিকে কী যেন বিড় বিড় করে বলে ওরা। লোকটি হাত থেকে সিগারেট ফেলেন না। বরং উচ্চস্বরে কর্মচারীদের বলেন–'তোমাগো নতুন ডাক্তাররে কইও লোক চিনা যেন কথা কয়। নাইলে কিন্তু চাকরি করবার পারব না।'
লজ্জায়, অপমানে নতমুখে আবার এসে চেয়ারে বসি। দ্রুত মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে হয় রোগীর প্রতি। অনেক রোগীর ভিড় যে!
বিড়ি বা সিগারেটের গন্ধ আমার মতো অধূমপায়ী অনেকেরই হয়তো সহ্য হয় না। কিন্তু শুধু কটু, বমি-উদ্রেককারী গন্ধই নয়–অধূমপায়ীদের ওপর এই ধোঁয়ার রয়েছে আরো ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব। আপনি হয়তো স্বেচ্ছায় ক্ষতিকর নিকোটিন গ্রহণ করছেন না, কিন্তু পাশের ধূমপায়ী ব্যক্তিটি আপনাকে বাধ্য করছে সেটি আপনার ফুসফুস দিয়ে দেহের ভেতর প্রবেশ করাতে। আপনি হচ্ছেন–'পরোক্ষ ধূমপায়ী'। পরোক্ষে হলেও কিন্তু নিকোটিন প্রবেশ করছে শরীরে এবং হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে আপনার স্বাস্থ্য।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার' (আইএআরসি) -এর বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রত্যক্ষ ধূমপান যেমন, তেমনি পরোক্ষ বা 'সেকেন্ড-হ্যান্ড' ধূমপানও ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। আপনি অধূমপায়ী, কিন্তু যদি আপনি নিয়মিত ধূমপায়ীর সঙ্গে বা পাশে বসবাস বা চলাচল করেন, সেক্ষেত্রে যারা ধূমপায়ীর সঙ্গমুক্ত তাদের তুলনায় আপনার ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, আপনি নারী হলে এ ঝুঁকি ২০ শতাংশ এবং পুরুষ হলে ৩০ শতাংশ বেশি। তেমনিভাবে, *জার্নাল অব দ্যা আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন*-এ প্রকাশিত গবেষণা-প্রবন্ধ অনুযায়ী, ধূমপায়ী-বেষ্টিত কর্ম-পরিবেশে অধূমপায়ীদের ফুসফুস ক্যান্সারের ঝুঁকি ১৬-১৯ শতাংশ বেশি।
ক্ষতিকর এ ধোঁয়ার সংস্পর্শে আপনি যত বেশি যাবেন, ততই ঝুঁকি বাড়বে। ক্যালিফোর্নিয়া এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সির হিসেব অনুযায়ী, প্রতি বছর তিন হাজার অধূমপায়ীর মৃত্যু হয় পরোক্ষ ধূমপানের ফলশ্রুতিতে হওয়া ফুসফুস ক্যান্সারে ভুগে। এ তো গেল কেবল ক্যান্সারের হিসেব। ফুসফুসের অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক রোগের ঝুঁকিও বাড়ে পরোক্ষ ধূমপানে। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, পরোক্ষ ধূমপান বাড়ায় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও, ক্ষেত্রবিশেষে এ ঝুঁকি ২৫-৩৫ শতাংশ বেশি। দক্ষিণ ক্যারোলিনা মেডিক্যাল

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে, স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ায় পরোক্ষ ধূমপান। স্ট্রোকে আক্রান্ত বাইশ হাজার ব্যক্তির উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২৩ শতাংশের নেপথ্য কারণ পরোক্ষ ধূমপান। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার এক গবেষণায় দেখা গেছে, পরোক্ষ ধূমপানের ফলে বেড়ে যায় লিভার বা যকৃতের রোগের আশঙ্কা। এ থেকে পরবর্তীতে লিভার অকেজোও হয়ে যেতে পারে।

শিশুদের উপর পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব মারাত্মক। ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেশন অন এনভায়রনমেন্টাল টোব্যাকো স্মোক এন্ড চাইল্ড হেলথ-এর তথ্যমতে, সারা বিশ্বে ৫০ শতাংশেরও বেশি শিশু নিজ ঘরে সেকেন্ড-হ্যান্ড স্মোকিংয়ের শিকার। যাদের বাবা-মা বাড়িতে ধূমপান করে, তেমন শিশুদের ফুসফুসের এবং কানের ইনফেকশন হওয়ার আশঙ্কা বেশি। হাঁপানি-আক্রান্ত শিশুদের হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হওয়ার হার ও তীব্রতাও বাড়ে পরোক্ষ নিকোটিনের প্রভাবে। এমনকি ধূমপায়ী বাবা-মা'র শিশুসন্তানদের হঠাৎ মৃত্যুর ঝুঁকিও বেশি।

ধূমপায়ী ধূমপান করে নিজের ক্ষতি করছে, অধূমপায়ী বলে আপনি ক্ষতির ঝুঁকিমুক্ত–এমন সরলীকৃত ভাবনার সুযোগ নেই। কেবল আপনার বাড়ির অন্য সদস্য, শিক্ষাক্ষেত্রে সহপাঠী, অফিস বা কর্মস্থলের সহকর্মী, চলার পথের সহযাত্রীটি ধূমপান করছে বলে ঝুঁকির মুখে পড়ছেন আপনি, আপনার আশপাশের অধূমপায়ী নারী-পুরুষ এবং অবুঝ শিশুটিও। তাই, সক্রিয়ভাবে ধূমপান প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন, নিজের গণ্ডির ভেতরেই গড়ে তুলুন সচেতনতা।

COMMERCIAL SPACE & READY APARTMENTS FOR SALE/ RENT

BORAK MEHNUR
Commercial Complex
at Kemal Ataturk Avenue

UNIQUE HEIGHTS
Residential cum Commercial
at Eskaton

BORAK ZAHIR TOWER
Commercial Complex
at Kazi Nazrul Islam Avenue

Please Call Us:
01713379450, 01713379451
01713379455, 01713379458

BORAK REAL ESTATE | Built for Life |

Borak Real Estate Ltd. is a concern of Unique Group

কর্মব্যস্ততা প্রভাব ফেলে যৌনজীবনে

ডা. এস এম আতিকুর রহমান
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

অফিস থেকে ফিরে অবসাদে ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া শফিকের আর তেমন কিছুই করার থাকে না। ঘুম ভেঙে উঠতে উঠতে রাত নয়টা বেজে যায়। তারপর ঘুম থেকে উঠে একটু বাজার-সদায়। রাত দশটায় ডিনার। ফেইসবুক, মেইল চেক করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়া। না ঘুমিয়ে উপায় নেই। সাত-সকালে উঠে অফিসে যেতে হয়। একটুও এদিক সেদিক হওয়ার উপায় নেই। জ্যামে পড়লে বিশ মিনিটের পথ দেড় ঘণ্টায়ও যাওয়া যায় না। এই হলো শফিক আর মিলার প্রাত্যহিক রুটিন। এই রুটিন ভাঙার সামর্থ্য ওদের নেই। মিলার স্কুল কিংবা শফিকের কোম্পানি কেউ-ই ওদেরকে ছাড় দেবে না। এই রুটিন শুধু শফিক আর মিলার নয়। নাগরিক জীবনের বেশিরভাগ দম্পতিরই প্রাত্যহিক জীবন এভাবেই চলছে। গার্মেন্টস কর্মী থেকে শুরু করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কর্মকর্তা সবার জীবনই এই ছকে বাঁধা। অর্থনীতির চাকা যত ঘুরবে আমাদের জীবনে ব্যস্ততা তত বাড়বে বৈ কমবে না। কোনো জরিপ ছাড়াই শুধুমাত্র রোগী

সম্প্রতি জার্নাল অব সেক্সুয়াল মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করলে দম্পতিদের মধ্যে যৌনমিলন লেস ফ্রিকুয়েন্ট বা মাঝে মধ্যে হয়। কিন্তু কর্মব্যস্ততার কারণে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘকালীন সম্পর্ক বা বয়স পঞ্চাশ তো দূরের কথা বিয়ের ছয় মাস যেতে না যেতেই দৈহিক সম্পর্কের মাত্রা কমে আসে।

দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় আমাদের কর্মব্যস্ততা আমাদের যৌনজীবনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অনেক রোগীকেই বলতে শুনি অফিস আর রাস্তায় শক্তি খরচ করার পর দৈহিক মেলামেশার মতো যথেষ্ট শক্তি তাদের থাকে না।

১৮৮৬ সালের ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেটে যে আট ঘণ্টা কাজের দাবি উঠেছিল তা শুধু শ্রমিকের জন্য নয়, সবার জন্যই প্রযোজ্য। সে সময়ের স্লোগান ছিল আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা বিনোদন আর আট ঘণ্টা বিশ্রাম। আজ যদি প্রশ্ন তুলি সত্যি কি আমরা তা উপভোগ করতে পারছি? তাহলে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় আমরা তা পারছি না। আমাদের অফিস আওয়ার কাগজে কলমে আট ঘণ্টা থাকলেও সেটা কার্যত দশ ঘণ্টা বা কখনো কখনো তার চেয়েও বেশি সময় নিয়ে নেয়। দীর্ঘক্ষণ কর্মব্যস্ত থাকার ফলে যা হয় তা হলো–যৌন বিষয়ে আগ্রহ কমে যাওয়া। সেক্স ড্রাইভ কমে যাওয়ার পেছনে তাই সবসময় সম্পর্কের জটিলতা বা বিষণ্নতাকে দায়ী করা যায় না। শুধু যৌনাকাঙ্ক্ষা নয়, মানুষের সব ধরনের ইচ্ছারই বাড়তি কমতি থাকে। কখনো আমরা অনেক বেশি শারীরিক চাহিদা অনুভব করি আবার কখনো একদম পানসে। সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে চললে যৌন-চাহিদা স্বাভাবিক নিয়মেই কমে আসে। এই কমে আসার কারণ মূলত দুটি–এক. পরস্পরের কাছে নতুনত্ব কমে যায়, দুই. সময়ের সাথে সাথে হরমোনেরও পরিবর্তন হয়।

সম্প্রতি *জার্নাল অব সেক্সুয়াল মেডিসিন*-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করলে দম্পতিদের মধ্যে যৌনমিলন লেস ফ্রিকুয়েন্ট বা মাঝে মধ্যে হয়। কিন্তু কর্মব্যস্ততার কারণে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘকালীন সম্পর্ক বা বয়স পঞ্চাশ তো দূরের কথা বিয়ের ছয় মাস যেতে না যেতেই দৈহিক সম্পর্কের মাত্রা কমে আসে।

কারণ হিসেবে দেখা যায় :

- মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্তি
- অতিরিক্ত কাজের চাপ
- কাজের চাপে বিধ্বস্ত অবস্থা

বিশেষ করে যারা ফিনানশিয়াল সেক্টরে কাজ করেন। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে আর্থিক অনিশ্চয়তা একটা বড় ব্যাপার। যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তাদেরকে সব সময় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। ফলে তাদের শরীরে অ্যাংজাইটি কেমিক্যাল অ্যাড্রেনালিন তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। এই অ্যাড্রেনালিন সেক্স ড্রাইভ কমিয়ে দেয়। আবার লিঙ্গোত্থান বা ইরেকশনেও সমস্যা দেখা দেয়। আপনি কোথায় কাজ করছেন সেটা বড় ব্যাপার নয়। আপনার কাজের চাপ কতটুকু সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মব্যস্ততা আমাদের যৌনজীবনকে যেভাবে প্রভাবিত করছে :

- সেক্স করার জন্য সময় কম পাওয়া
- ক্লান্তি বা অবসাদের কারণে আগ্রহ কমে যাওয়া
- যৌন উত্তেজনার চরমে উঠতে সমস্যা হওয়া
- রিলাক্স হতে সমস্যা হওয়া
- নারীর ক্ষেত্রে মিলনের আগে যথাযথ না ভেজা
- পুরুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গোত্থান সহজে না হওয়া
- স্ট্রেস অনুভবের জন্য সঙ্গীর সঙ্গে রোমাঞ্চ এবং খুনসুটি করতে ব্যর্থ হওয়া
- একঘেয়েমি
- কর্মব্যস্ততার কারণে শারীরিক মিলনের সময় সঙ্গীর হতাশ অথবা বিরক্ত লাগা

এরকমভাবে চলতে থাকলে এক সময় সম্পর্ক ভেঙেও যেতে পারে। অথবা আপনার সঙ্গী পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। তাহলে কী করবেন? কাজ তো আর ছেড়ে দেয়া যাবে না। বরং আপনার জীবনধারায় একটু পরিবর্তন আনুন। সকালের নাস্তায় এমন কিছু খান যা থেকে ধীরে ধীরে শক্তি পাওয়া যায়। দুপুরে লাঞ্চ অবশ্যই করবেন। লাঞ্চে সালাদ রাখবেন। পানি খাবেন পর্যাপ্ত পরিমাণে। চিকিৎসকরা পানি খেতে উৎসাহিত করেন বলে অনেকেই বেশি বেশি পানি খান। সেটা যেন না হয়। মনে রাখবেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আপনার কিডনির ওপর কাজের চাপ বাড়িয়ে দেয়। এসবের পাশাপাশি ব্যায়াম করবেন। ব্যায়ামের জন্য আলাদা করে সময় বের করতে না পারলে অফিসে যাওয়ার সময় খানিকটা হাঁটুন।

আপনি হয়তো ভাবছেন ক্যারিয়ারের কথা ভাবতে গেলে এসবের সময় কোথায়? কিন্তু মনে রাখবেন জীবনে সবকিছুর সাম্যতা ফিরিয়ে আনতে না পারলে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। জীবনের শূন্যতা ব্যাংক ব্যালেন্সে পূর্ণ হবে কি?

বৃদ্ধদের দায়িত্ব কার

আবু তালহা, সংবাদকর্মী

সরকারি প্রণোদনা ক্যান্সার-কিডনি-লিভারসিরোসিস-স্ট্রোকে, প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত বয়স্কদের পুনর্বাসন, বয়স্ক-ভাতা, বিধবা-ভাতা দিয়েও বৃদ্ধদের দায়িত্ব নিতে উৎসাহিত করা যাচ্ছে না। রাজধানী ঢাকা ছাড়াও বিশেষত মহানগরগুলোতে বয়স্কদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর প্রবণতা বেড়েই চলেছে।

এই প্রবণতার গলায় লাগাম দিতে এবং বয়স্কদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ২০১৩ সালে পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন পাস করে সরকার। তাতে মা-বাবার ভরণপোষণ দেয়া সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। সন্তান মা-বাবার সঙ্গে বসবাস করবে–এমন বিধানও রাখা হয় আইনে।

আইনে ভরণপোষণ বলতে খাবার, পোশাক, চিকিৎসা, থাকার জায়গা এবং সঙ্গ দিতে বলা হয়েছে।

আইনটির ৩ ধারায় বলা হয়, প্রত্যেক সন্তানকে তার মা-বাবার ভরণপোষণ নিশ্চিত করতে হবে। কোনো মা-বাবার একাধিক সন্তান থাকলে সেক্ষেত্রে সন্তানরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে ভরণপোষণ নিশ্চিত করবে।

আরো বলা হয়, কোনো সন্তান তার মাকে কিংবা বাবা অথবা দুজনকে তার বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বৃদ্ধনিবাস কিংবা অন্য কোথাও একত্রে কিংবা আলাদাভাবে বাস করতে বাধ্য করতে পারবে না।

তাছাড়া সন্তান তার মা-বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখবে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করবে।

আইনে বলা হয়, কোনো সন্তানের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে বা নিকটাত্মীয় যদি বৃদ্ধ মা-বাবার প্রতি সন্তানকে দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়, তাহলে তারাও অপরাধী বিবেচিত হবেন। ফলে তারাও শাস্তির মুখোমুখি হবেন।

মা-বাবার ভরণপোষণ আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী, মা-বাবার ভরণপোষণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি দাদা-দাদি, নানা-নানিকেও ভরণপোষণ দিতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে পিতা যদি বেঁচে থাকে তাহলে সন্তানকে দাদা-দাদির এবং মা বেঁচে থাকলে নানা-নানির ভরণপোষণ দিতে

হবে না।
আইনের ৩ এর (৭) ধারা অনুযায়ী, মা-বাবা যদি সন্তানের সঙ্গে না থাকে, আলাদা বসবাস করে, সেক্ষেত্রে বাবা-মায়ের প্রত্যেক সন্তান তাদের দৈনন্দিন আয়, মাসিক আয় বা বাৎসরিক আয় থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ দেবেন। অথবা মাসিক আয়ের কমপক্ষে দশ ভাগ বাবা-মাকে দেবেন।
কোনো ব্যক্তি এই আইন না মানলে অপরাধী বিবেচিত হবে। অপরাধের আমলযোগ্যতা, বিচার ও জামিন সংক্রান্ত বিষয় আইনের বিধানে বলা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারযোগ্য হবে। কোনো আদালত এ আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট সন্তানের বাবা বা মায়ের লিখিত অভিযোগ ছাড়া আমলে নেবে না।
আইনটির ৫ (১) ধারা অনুযায়ী, যদি কোনো বৃদ্ধ বাবা বা মা তার সন্তানদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনো অভিযোগ আনেন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের এক লাখ টাকা জরিমানা দিতে হবে। অথবা তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।
এই আইন অনুযায়ী মা-বাবাকে প্রতিকার চাইতে হলে প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে লিখিত আবেদন করতে হবে। এ আইনের অধীনে অপরাধ হবে আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপসযোগ্য। আদালত ইচ্ছা করলে প্রথমেই বিষয়টি আপস-মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপ নিতে পারেন। বিষয়টি ইচ্ছা করলে আপস-নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বার, কিংবা সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর কিংবা অন্য যে-কোনো উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে পাঠাতে পারেন আদালত। কোনো আপস-মীমাংসার জন্য পাঠানো হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাবা, মা এবং সন্তান উভয় পক্ষের শুনানি শেষে নিষ্পত্তি করতে পারবে। কোনো অভিযোগ এভাবে নিষ্পত্তি হলে তা আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।
আইন করেও বৃদ্ধাশ্রম নিরুৎসাহিত করা যাচ্ছে না। রাজধানীর মিরপুর তালতলা জনতা হাউজিংয়ে বসবাস করেন জান্নাতুল ফেরদৌসী। গত তিন বছর যাবৎ আগারগাঁও প্রবীণহিতৈষী কেন্দ্রের এক বৃদ্ধার দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জানান, ঔষধ এবং হাতখরচের ব্যয় বহন করেন তিনি। কোনো মাসে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে সাড়ে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। এটা খুব বেশি টাকা না। আর পরিবারে একজন মানুষ বেশি থাকলে সার্বিকভাবে যে খরচ অনেক বেড়ে যায়–এমন না। আসলে আমাদের ভেতর থেকে দায়িত্ব নেওয়ার মানসিকতা হারিয়ে যাচ্ছে।
সৈয়দা সেলিনা শেলী ২০১০ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে উত্তরখানের মৈনারটেক এলাকায় 'আপন নিবাস' নামে অসহায় ও দুস্থ নারীদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম চালু করেন। শুরুতে সেখানে ছিল মাত্র ৭ জন বৃদ্ধা। এখন সেখানে রয়েছে ২৫ জন বৃদ্ধা। তাদের বয়স ৬০ থেকে ৭০ বছরের বেশি। মুষ্টিরচাল সংগ্রহ করে শুরুতে বৃদ্ধাশ্রমের ব্যয় চালানো হতো।
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এখন বাসা ভাড়া নিয়ে চালু করা হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রম চালু করা হচ্ছে। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এসব আশ্রমের বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অনিয়ম, অপরাধ এবং দুর্নীতির অভিযোগ। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক তাসনুভা রহমান। সম্প্রতি তার বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি আগ্রহী হন কোনো একটি বৃদ্ধাশ্রমে অন্তত একবেলা খাবার ব্যবস্থা করবেন। অব্যবহৃত পোশাক দেবেন। নিয়মিত প্রতিমাসে কিছু টাকাও দেবেন বৃদ্ধাশ্রমে।
তাসনুভা রহমান জানান, আমি আমার কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠিয়েছিলাম কল্যাণপুর নতুনবাজারে একটি বৃদ্ধাশ্রমে। কিছু টাকা, খাবার এবং পোশাক দিয়েছিলাম। আমার ছাত্র-ছাত্রীরা এসবের বাইরে এক বৃদ্ধার হাতে কিছু টাকা দেয়। প্রথমে ওই বৃদ্ধা নিতে অস্বীকৃতি জানান, জোর করলে নেন। ঘটনাটি ওই বৃদ্ধাশ্রমের দায়িত্বরত একজন কর্মী দেখে ফেলেন এবং আমার ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর চড়াও হন। তিনি বলেন, কারও জন্য কিছু দিতে হলে সরাসরি দেওয়া যাবে না–তার মাধ্যমে দিতে হবে। কেন তার হাতে টাকা না দিয়ে সরাসরি দেওয়া হয়েছে–বিষয়টি নিয়ে অসহযোগিতামূলক আচরণ করেন। এমনকি শিক্ষার্থীদের সামনেই ওই বৃদ্ধাকে গালাগালি দেন।
এই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে প্রতিটি সন্তানের উচিত তাদের দায়িত্ব নেওয়া। ভুলে গেলে চলবে না, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন তারা আমাদের দায়িত্ব নিয়েছেন।
রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব আছে কোনো মানুষ বৃদ্ধ হয়ে তার নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা। আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হচ্ছি, এখন থেকেই এই বিষয়টিতে আরো গুরুত্ব দেওয়া উচিত সরকারের। সমাজেরও দায় আছে কোনো ব্যক্তি অসহায় হলে বা দুস্থ হলে তারপাশে দাঁড়ানোর। এই সহযোগিতা করা যেন সহজ হয়, সেটাও দেখতে হবে সরকারকে। বৃদ্ধাশ্রমগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে যেন অনিয়ম, দুর্নীতি না হয়। অসহায় মানুষগুলো আশ্রয়হীন হয়ে, দুস্থ হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে যান। সেখানেও যদি তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়–এর চেয়ে নির্মম আর কিছু হতে পারে না।
প্রবীণদের নিরাপত্তা ও সুংরক্ষা নিশ্চিত করতে একই বছরের ১ জুলাই চীনে 'এলডারলি রাইটস ল' বা প্রবীণ অধিকার আইন পাস হয়। তাতে বলা হয়, সন্তানদের অবশ্যই বৃদ্ধ বাবা-মার দেখাশোনা করতে হবে। ৭৭ বছরের বৃদ্ধ যে মা ৪০ কিলোমিটার বা ২৫ মাইল দূরে থাকেন, তাকে বন্ধের দিনগুলো ছাড়াও দুইমাসে অন্তত একবার দেখতে যেতে হবে।

ভালো থাকার জন্য নিয়ম মেনে চলি

ফরিদা পারভীন, সংগীত শিল্পী

কিংবদন্তিতুল্য সংগীত শিল্পী তিনি। বিশেষ করে লালন শিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি আকাশছোঁয়া। সঙ্গীতময় কর্মজীবনে তিনি গেয়েছেন লোকগান, আধুনিক, দেশাত্মবোধকসহ অসংখ্য গান। পেয়েছেন ফুকুওয়াকা এশিয়ান কালচারাল প্রাইজ, রাষ্ট্রীয় একুশে পদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ দেশে-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। তিনি ফরিদা পারভীন। মনের খবর পাঠকদের এবার তিনি জানাচ্ছেন তাঁর মনের কথা, ভালোলাগার কথা, স্বপ্নের কথা, পরিকল্পনার কথা, জীবন দর্শনের কথা। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন মুহাম্মদ মামুন।

কেমন আছেন?
আল্লাহর রহমতে ভালো আছি।

ভালো থাকার জন্য কী করেন?
ভালো থাকার জন্য একটু নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলাফেরা করি। যেহেতু নিয়ন্ত্রণহীনতা বিপর্যয় ঘটায়, সেহেতু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে লোভ-লালসা থেকে একটু পরিশুদ্ধতা লাভের চেষ্টা করি।

মন খারাপ হয়?
হ্যাঁ, মন খারাপ হয়।

মন খারাপ হলে কী করেন?
মন খারাপের ব্যাপারটা একদিক থেকে ভালো, এতে পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। আর যেহেতু আমি সংগীত শিল্পী, লালনের গান করি, সঙ্গীতের জন্য কষ্টটা খুব দরকার।

কেন?
কারণ সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত বেদনাটা এবং যিনি গান করেন তার বেদনাটা যদি মিলে যায়, তাহলে যিনি গান করেন বা যারা গান শোনেন তাদের হৃদয় উপশম হয়।

লালন শিল্পী হয়ে ওঠার ইচ্ছেটা কীভাবে এলো?
লালন শিল্পী হয়ে ওঠার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমার যে সংগীতগুরু মোকসেদ আলী সাঁই, উনি স্বাধীনতার পর এক লালন উৎসবে আমাকে গাইতে বললেন। স্টেজে আমার প্রথম লালনের গান 'সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন' গাইলাম। এরপর থেকেই আস্তে আস্তে লালনের গানের প্রতি ভালোলাগা তৈরি হলো।

রাগ হয়?
হ্যাঁ হয়। হয়তো বড় কারণে অনেক সময় রাগ হয় না কিন্তু ছোট ছোট কারণে রাগ হয়ে যায়।

রাগ হলে কী করেন?
রাগ হলে অভিমানটা বেড়ে যায়। এমন অনেক রাগ আছে মনে হয় যার ওপর রাগ হলো তার সঙ্গে আর বেশি সময় সম্পর্ক রাখব না। রাগ হলে দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টে যায়।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করেন কীভাবে?
রাগ হলে সচরাচর সেটা কাউকে বুঝতে

দিতে চাই না, তারপরও অনেক সময় অবয়ব দেখে অনেকে বুঝতে পারে, কোনো কারণে আমি মনক্ষুণ্ন আছি।

রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন জিনিসটা সবচেয়ে জরুরি?

রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটু ধৈর্যশীল হতে হবে। সাঁইজি তাঁর কথার মধ্যেও রাগ নিয়ন্ত্রণের কথা বলে গেছেন, আবার আমরা যারা মুসলমান তাদের ধর্মীয় গ্রন্থেও মানুষকে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে।

হিংসা আছে?

আছে।

হিংসাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

হিংসাটা যদি ভালো কাজে বা ভালো উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে সেটি বরং ভালো। যেমন সে একটা ভালো কাজ করছে আমি কেন করছি না। এমন একটা মনোভাব সবার জন্যই ভালো।

স্মৃতিকাতরতা আছে?

প্রত্যেকটা মুহূর্তই তো মানুষের স্মৃতি। এরপর একদিন অনন্তকালের কাছে চলে যেতে হবে, দুনিয়ার যা কিছু স্মৃতি সব নীরবে নিরাঞ্জন হবে, অর্থাৎ সব স্মৃতি পানিতে মিশে যাবে। তাই এ স্মৃতি মূল্যহীন। সেজন্যই সাঁইজি বলেছেন,

‘গুণে পড়ে সারলি দফা
করলি রফা গোলেমালে।
ভাবলিনে মন কোথা সে ধন
ভাজলি বেগুন পরের তেলে।।’

তারপরও যতক্ষণ আমরা বেঁচে থাকি দুনিয়ার কোনো না কোনো স্মৃতি আমাদের মনকে নাড়া দেয়?

যতক্ষণ শ্বাস আছে ততক্ষণ তো স্মৃতি রোমন্থনের ব্যাপারটাও আছে। ছোটবেলার স্মৃতি, কৈশোরের স্মৃতি, পরিণত বয়সের স্মৃতি, সন্তানের মা হওয়ার স্মৃতি। এ স্মৃতিগুলো রোমন্থন করতে ভালো লাগে।

কোন স্মৃতি আপনাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়?

সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাগে মঞ্চে গান গাওয়ার স্মৃতিগুলো। গান গেয়ে যখন দর্শক-শ্রোতাদের ভালোবাসা পাই বা আমার গাইতে ভালো লাগে। আর ওই মুহূর্তগুলোর স্মৃতি আমাকে অনেক বেশি আনন্দ দেয়। আবার কখনো উল্টোটাও হয়, কখনো হয়তো আমি গান গাওয়ার মুড পাচ্ছি না বা গান গাইতে গিয়ে নিজের কাছে নিজে আমি হোঁচট খাচ্ছি। শ্রোতারা হয়তো সেটি বুঝতে পারছে না কিন্তু নিজের কাছে নিজের এই যে হোঁচট খাওয়া সেটি আমাকে কষ্ট দেয় অনেকদিন।

সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাগে মঞ্চে গান গাওয়ার স্মৃতিগুলো। গান গেয়ে যখন দর্শক-শ্রোতাদের ভালোবাসা পাই বা আমার গাইতে ভালো লাগে। আর ওই মুহূর্তগুলোর স্মৃতি আমাকে অনেক বেশি আনন্দ দেয়। আবার কখনো উল্টোটাও হয়, কখনো হয়তো আমি গান গাওয়ার মুড পাচ্ছি না বা গান গাইতে গিয়ে নিজের কাছে নিজে আমি হোঁচট খাচ্ছি। শ্রোতারা হয়তো সেটি বুঝতে পারছে না কিন্তু নিজের কাছে নিজের এই যে হোঁচট খাওয়া সেটি আমাকে কষ্ট দেয় অনেকদিন।

স্বপ্ন দেখেন?

স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি আমার ফাউন্ডেশন নিয়ে, আমার চিন্তা নিয়ে, আমার সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান ‘অচিন পাখি’ নিয়ে।

কেমন সে স্বপ্নগুলো?

স্বপ্ন আছে আমার ফাউন্ডেশন দিয়ে লোকগানের জন্য কাজ করা। স্বপ্ন আছে ‘অচিন পাখি’ শিক্ষালয়ের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের গান শেখানো বা ছবি আঁকা শেখার কাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বাংলা লোকগান নিয়ে আপনার পরিকল্পনাগুলো কী?

লোকগানের যেহেতু স্বরলিপি হয় না, তাই লোকগানগুলো সবসময় পরিবর্তনশীল। আমি আমার গুরুর থেকে সংগীতের যে তালিম পেয়েছি, সেটিকে

প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা আছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, 'ফরিদা পারভীন ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে একটি লালন গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে লোকগানের গবেষণা হবে। লোকগানের যে যন্ত্রগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে সংরক্ষণ করা হবে। আগামী প্রজন্ম যাতে দেখে বোঝে, এটিই আমাদের শেকড়। এটিই আমাদের পরিচয় বহন করে। আগামীর প্রজন্ম যাতে দেখতে পারে, বুঝতে পারে, অনেক অনেক জাতির চেয়ে আমাদের ঐহিত্য অনেক অনেক সমৃদ্ধ। এখানে লালন ফকির আছেন, হাছন রাজা আছেন, রাধারমণ দত্ত আছেন, উকিল মুন্সী আছেন, দুদু শাহ্ আছেন, জালাল খাঁসহ আরো অনেক অনেক মরমী কবি যে দেশে রয়েছেন, সে দেশের সংস্কৃতি অনেক অনেক সমৃদ্ধ।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৃষ্ঠপোষকতা কেমন পাচ্ছেন?

পৃষ্ঠপোষকতা হয়তো সেভাবে আমি চাইনি। তবুও কিছু মানুষ আমার ফাউন্ডেশনের কথা জানে। এখানে একটু অভিমানও কাজ করে। কাউকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করা হলে সরকারেরও বোধহয় কিছু দায়িত্ব থাকে, যে কারণে একজনকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করা হলো তাকে সে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করা।

বাংলাদেশে এখন বেসরকারি পর্যায়ে লোকসংগীতের ওপর আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। এটা লোকসংগীতকে কতটা সমৃদ্ধ করছে বলে মনে করেন?

অবশ্যই এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সংগীতের শেকড় এসে আমাদের দেশে মিশছে। আমাদের দেশের মানুষ নিজেদের সংগীতের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

আমাদের যে লোকগানের ধারা সেটার মূল সুরটা কি অন্য দেশের মানুষজনের কাছে পৌঁছাচ্ছে?

এ ব্যাপারটা একটু প্রশ্নবিদ্ধ। যন্ত্রের অতি ঝনঝনানির মধ্যে লোকগানের মূল সুরটা হয়তো অনেকটাই হারিয়ে যায়।

বাংলা লোকসংগীতে এখন অনেক নতুন মুখ আসছে। এটাকে কি বাংলা লোকসংগীতের অগ্রগতি হিসেবে দেখতে পারি না?

অবশ্যই এটা একটি শুভ সংবাদ। নতুনরা লোকসংগীতের ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী হচ্ছে, তারা গাইছে, বাজাচ্ছে। আবার একই সঙ্গে নতুনদের আরেকটু সচেতন হতে হবে, বিশেষ করে আমাদের লোকসংগীতের যে ধারা রয়েছে, ট্র্যাডিশনাল বাদ্যযন্ত্রের যে ব্যবহার রয়েছে, সেটির শিক্ষায় পরিপূর্ণতা আনতে। নইলে সাময়িক উন্মাদনা তৈরি হলেও তা মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিতে পারবে না।

আপনি নিজে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের লোকসংগীতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন একই সঙ্গে দেশে-বিদেশে পেয়েছেন অনেক অনেক সর্বোচ্চ পুরস্কার ও সম্মাননা। বাংলা লোকগান নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?

আসলে সুর-সংগীত এগুলো হলো শাশ্বত। যে দেশ যে ভাষাই হোক, সুরের অনুভূতিটা সব দেশেই, সব জাতিতেই এক। যেমন আমি আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা বলি, সুইডেনের এক অনুষ্ঠানে আমি গান করছি, গান শুনে দেখলাম সুইডেনের রানি কাঁদছেন। গান শেষে উনি আমাকে বললেন, আমি তোমার ভাষা বুঝি না। কিন্তু গানের সুরটাই আমাকে বলে দিচ্ছে এটি একটি মরমী গান।

ব্যক্তি জীবনে আপনার মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার দূরত্ব কতটুকু?

চাওয়ার চেয়ে পেয়েছি অনেক বেশি। এক সময় চাওয়া ছিল শুধু রেডিওতে গান গাইতে পারার। এরপর একে একে টেলিভিশন, গানের অ্যালবাম, বিভিন্ন দেশে বাংলা লোকগানের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ। দেশে-বিদেশে পুরস্কার ও সম্মাননা, মানুষের ভালোবাসা। পরিশেষে আল্লাহর অভিপ্রায় ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন অনেক।

সবশেষে পাঠকদের উদ্দেশে কিছু বলুন।

পাঠকদের উদ্দেশে লালন সাঁই-এর বলা দুটি কথা বলব শুধু। এক, সময় গেলে সাধন হবে না। দুই, সত্য বল সুপথে চল। সময় থাকতে সবাই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হোক। সুন্দর জিনিসগুলোকে গ্রহণ করে সত্য ও সুপথে চলার বাসনা তৈরি করুক সবাই। আমাদের এই বাংলা ভাষায় অনেক অনেক সুন্দর উপাত্ত রয়েছে। সুন্দর গল্প-কবিতা-গান রয়েছে, সেগুলো তারা গ্রহণ করুক এবং অসুন্দরকে প্রত্যাখ্যান করুক।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

ধন্যবাদ আপনাকেও।

(মনের খবর অনলাইন থেকে নেয়া)

ATLAS
ZONGSHEN
WARRANTY
3 YEARS
WARRANTY
এটলাস জংশেন ব্র্যান্ডের
মোটরসাইকেল কিনুন
দেশ ও জাতির সেবায়
এগিয়ে আসুন
Since -1966
150 CC
125 CC
150 CC
এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড
শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন বিএসইসি'র একটি প্রতিষ্ঠান
www.atlas.gov.bd

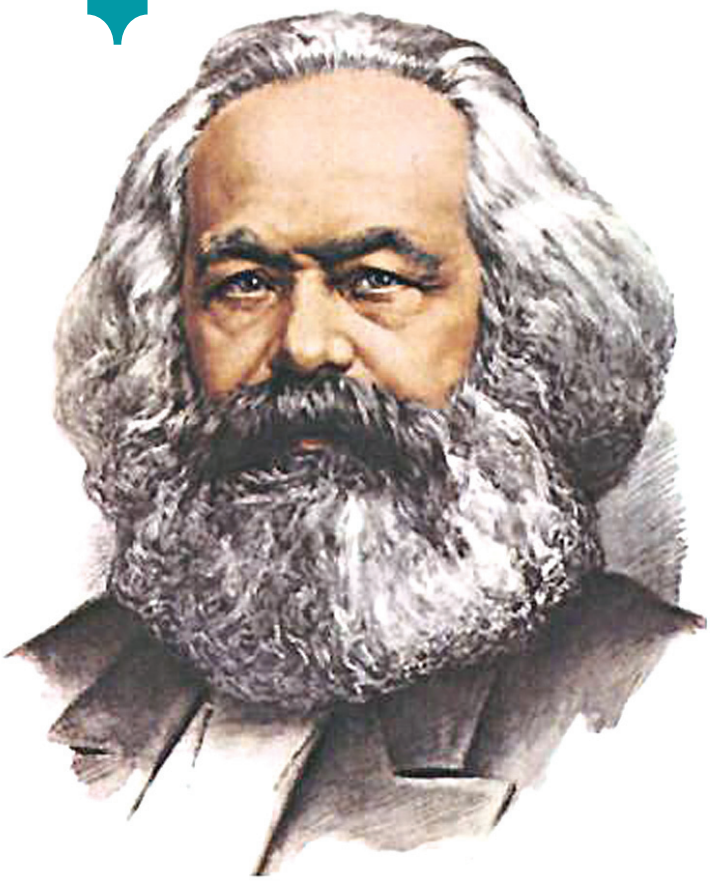

কার্ল মার্কস

জন্ম : ৫ মে ১৮১৮, মৃত্যু : ১৪ মার্চ ১৮৮৩

ডা. জিল্লুর কামাল
প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

ইউরোপের পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে যিশু খ্রিষ্টের পর আর কোনো ব্যক্তিত্ব পৃথিবীজুড়ে মানুষের ওপর এমন সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। কথাটার মধ্যে অতিরঞ্জন হয়তো খুব বেশি নেই। ৯০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ভাঙনের আগ পর্যন্ত পৃথিবীর ডান ও বাম শিবিরে মার্কসকে নিয়ে, তাঁর তত্ত্ব নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে আর কারো বিষয়ে এত আলোচন-সমালোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। ডান শিবিরের ভাষ্যমতে, মার্কস মানে মূর্তিমান এক দানব, সকল অনাসৃষ্টির হোতা, শ্রমিক অশান্তি, মজুরি বৃদ্ধির অত্যাচার, শ্রমিকের মানবিক জীবনের সংগ্রামের নামে উৎপাদন ব্যহত করার পরামর্শদাতা। আর ডান শিবিরের সহযোগী মৌলবাদী দলগুলোর কাছে নাস্তিক্যবাদ প্রাচারের পুরোহিত। অন্যদিকে বাম শিবিরের কাছে মার্কস মানবমুক্তির প্রতীক, সমতাভিত্তিক পৃথিবীর স্বপ্নদ্রষ্টা ও তাত্ত্বিক–ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবজাতির ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক। মার্কস বিষয়ক এতসব তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক আলোচনা-সমালোচনার নিচে চাপা পড়ে যায় ব্যক্তি মার্কস।

মার্কস আসলে কেমন ছিলেন?

ইহুদি থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান পিতা হেনরিখ মার্কস ও মা হেনেরিয়টার ঘরে ৫ মে ১৮১৮ জার্মানির রাইন জেলার ট্রিয়ার শহরে কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেন। ৪ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তবে বড় ভাইটি মারা যাওয়ার কারণে তিনিই হয়ে পড়েন জ্যেষ্ঠ সন্তান। বাবা হেনরিখ মার্কস ছিলেন কয়েকটি আঙুর বাগানের মালিক এবং সরকারি এটর্নি। মা হেনেরিয়েটা সাধারণ গৃহিণী। ১৮৩৫ সালে ভর্তি হন বন ইউনিভার্সিটিতে আইন পড়ার জন্য। কিন্তু তিনি হৈ-হাঙ্গামা করে সময় কাটাতে থাকেন।

সন্তানটিকে পথে আনার জন্য মার্কসের বাবা এক বছর পরই তাঁকে ভর্তি করান বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে, সেখানে এসব হৈ-হাঙ্গামার সুযোগ নেই। বার্লিন এসে কিছুদিন আইন পড়বেন না দর্শন পড়বেন এই নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর পিতাকে হতাশ করে জানিয়ে দিলেন যে তিনি দর্শন চর্চাই পছন্দ করবেন। এসময় তিনি দর্শনের ক্ষেত্রে দার্শনিক জি ডাব্লিউ এফ হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) ও কবিতার ক্ষেত্রে কবি হাইনরিখ হাইনের (Christian Johann Heinrich Heine) অনুরাগী হয়ে ওঠেন। কাব্যতত্ত্ব ও ব্যাকরণ নিয়ে পড়াশোনা করেন। *স্করপিয়ন এন্ড ফিনিক্স* নামে উপন্যাস এবং কিছু কবিতা লেখেন এবং অচিরেই বুঝে ফেলেন যে সাহিত্য চর্চা তাঁর কাজ নয়। সে সময়ই তিনি সাহিত্য চর্চা পরিত্যাগ করেন।

বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার তিন বছর তাঁকে ক্লাসে যেতে দেখা গেছে খুব কমই। কিন্তু পড়ালেখা চলছিল তাঁর নিজের তালে। তিনি যথাসময়ে তাঁর ডক্টরেট

থিসিস *ডেমোক্রিটিয়ান এবং পিকিউরিয়ান দর্শনের পার্থক্য* লেখা শেষ করেন। কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শেলিং ঘোরতর হেগেলবিরোধী হওয়ায় মার্কস সেখানে তাঁর থিসিস জমা না দিয়ে জমা দেন ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। থিসিস জমা দেয়ার নয় দিন পর ১৮৪১ সালের ১৫ এপ্রিল তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এতে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরি পাওয়ার পথ প্রশস্ত হলো। কিন্তু তখনি কাজ খোঁজার বদলে তিনি গ্রীষ্মটা কাটাতে বনে গেলেন বন্ধু ব্রুনো বাউয়ারের কাছে। পুরো গ্রীষ্মটা দুই বন্ধুর কাটল দিনরাত মাতলামি আর নানা কৌশলে লোকজনকে উত্যক্ত করার মধ্য দিয়ে। অবশ্য এসময় ব্রুনো ও মার্কস মিলে ছদ্মনামে পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন 'খ্রিষ্ট বিরোধী এবং নাস্তিক হেগেলের বিরুদ্ধে বিচারের শেষ ধাপ' শিরোনামে। পরিণামে ব্রুনো হলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত আর মার্কসের শিক্ষক হওয়ার পথ হলো বন্ধ।

মার্কসের লেখা সবসময়ই তাঁর নিজের জন্য এবং যে পত্রিকায় লিখছেন তাঁর জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো কোনো লেখার জন্য পত্রিকা হয়েছে বন্ধ আর মার্কস হয়েছেন বহিষ্কৃত। তবু মত প্রকাশের ক্ষেত্রে মার্কস সারাজীবনই ছিলেন একরোখা ও দুর্বিনীত। পুঁজিবাদী সরকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অমানবিক ব্যবস্থা-নীতি ও আচরণের প্রতি তিনি যেমন ছিলেন ব্যাঘ্রসম প্রতিবাদী তেমনি ভাববাদী মধ্যপন্থী ও সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিহীন তথাকথিত বিপ্লবীদের প্রতি ছিলেন ক্ষমাহীন নির্দয় ধরনের সমালোচক।

নিজের মতামত ও দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেমন তিনি অনবরত লিখে গিয়েছেন তেমনি তা বাস্তবায়িত করার অন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন সংগ্রামও করেছেন সারাজীবন।

লেখালেখি আর আন্দোলন সংগ্রামের মাসুল হিসেবে মার্কসকে একে একে বহিষ্কার করেছে জার্মান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ড। সর্বশেষ তিনি আশ্রয় নেন ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ড তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে কিন্তু তাঁর নাগরিকত্বের আবেদন নাকচ করেছে। মৃত্যুকালে মার্কস কোনো দেশেরই নাগরিক ছিলেন না। এজন্যই কি তিনি এখন বিশ্বনাগরিক?

সারাজীবন উৎপাদন-মুনাফা আর সম্পদের সম্পর্ক নিয়ে ভাবনায় মগ্ন, যুগান্তরকারী বই *পুঁজি*'র রচয়িতা এই ব্যক্তিটির আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই করুণ।

নিজেকে ধনবান করার ব্যাপারে কোনো দিনই মার্কসের কোনো আগ্রহ ছিল না। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি, নিজের প্রকাশিত বই থেকে রয়্যালিটি–এই ছিল মার্কসের আয়ের উৎস। তবে আন্দোলন সংগ্রামে ব্যস্ত থাকা, পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়া, লিভারের ব্যথা, কার্বাঙ্কল ও বাতে আক্রান্ত ভঙ্গুর শরীর নিয়ে লেখালেখির কাজটাও পুরো সময় ধরে করতে পারতেন না তিনি।

জেনির তৎপরতা এবং এঙ্গেলসের সহযোগিতায় মার্কস-পরিবারের কোনো রকমে দিন চলে যেত। কয়েকবার মার্কসকে চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ১৮৬২ সালে নিরুপায় মার্কস লন্ডন রেলওয়েতে ক্লার্ক পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। হাতের লেখা খারাপ বলে তাঁর চাকরিটা হয়নি।

লন্ডনে লেখালেখির পাশপাশি নির্বাসিত তরুণদেরকে ভাষা-অর্থনীতি ও দর্শন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া, পরিবার পরিজন নিয়ে হ্যাম্পস্টিড হিথে ভ্রমণ ও খেলাধুলা, নির্বাসিত ফরাসিদের ক্লাবে গিয়ে তলোয়ার খেলায় সময় কাটাতেন মার্কস।

মার্কসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত অভিযোগ হচ্ছে–তিনি নাস্তিক্যবাদের প্রচারক। সত্যি কথাটা হলো মার্কস নিজে নাস্তিক ছিলেন ঠিকই কিন্তু নাস্তিক্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর কোনো কর্মসূচির মধ্যই ছিল না। তিনি কোনো রাখঢাক না রেখেই বলতেন, 'আমার সংগ্রাম পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে'।

ধর্ম সম্পর্কে তিনি তাঁর মনোভাব *টুওয়ার্ডস এ ক্রিটিক অব হেগেল ফিলোসফি অব রাইট: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন*-এ প্রকাশ করেছেন–'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম একদিকে যেমন মানুষকে দমিয়ে রাখার হাতিয়ার, অন্যদিকে তা তেমনই নির্যাতনকারীকে প্রত্যাখ্যানেরও একটি মাধ্যম। নির্যাতিত মানুষের কাছে ধর্ম হচ্ছে দীর্ঘশ্বাস মোচনকারী, হৃদয়হীন পৃথিবীতে একটি শান্তিপূর্ণ আশ্রয় আর আত্মাহীন পৃথিবীতে আত্মার সুখ–ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম।'

দ্বান্দিক বস্তুবাদী দর্শনের প্রবক্তা মার্কসের সবচেয়ে বড় সাফল্যের একটি হলো–'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' হাজির করে মুনাফা যে আসলে শ্রমিকের নিজের সৃষ্ট একটি বিষয় এবং তা-ই এতে শ্রমিকের অধিকার আছে এই বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অন্যটি হলো দ্বান্দিক বস্তুবাদী ধারায় ইতিহাসের ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখানো যে সভ্যতার ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস এবং এই সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের বিলোপের মধ্য দিয়ে শ্রেণিহীন সমাজের প্রতিষ্ঠাই সমাজ বিকাশের চূড়ান্ত পরিণতি।

প্রচলিত ধ্যান-ধারণার দার্শনিকদের মতো তিনি শুধু মত প্রকাশ করেই বসে থাকেননি না বরং লিখেছেন–'এতদিন যাবৎ দার্শনিকরা পৃথিবীটাকে নানা উপায়ে ব্যাখ্যা করে এসেছেন। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে পৃথিবীকে পাল্টানো।' ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ বুধবার মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজের চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজ করে গেছেন।

১৭ মার্চ, ১৮৮৩ সালে হাইগেট সেমেট্রিতে মার্কসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত মাত্র ১১ জন মানুষের উদ্দেশ্যে শোক বক্তৃতায় এঙ্গেলস বলেন, 'মার্কসের নাম এবং কার্যাবলী প্রজন্মের পর প্রজন্মকে উজ্জীবিত করবে।' তিনি সম্ভবত ভুল বলেননি।

তথ্যসূত্র : জাকির তালুকদার, কার্ল মার্কস মানুষটি কেমন ছিলেন (ঐতিহ্য, ২০১৫)।

ইনসুলিন কোমাথেরাপি

ডা. তৈয়বুর রহমান রয়েল
রেসিডেন্ট, এমডি (সাইকিয়াট্রি)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

অনেকেই নিশ্চয় অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র *A Beautiful Mind* ছবিটি দেখেছেন। অন্তত নাম শুনেছেন। সে ছবিতে রাসেল ক্রো প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. জন ন্যাশের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। সিজোফ্রেনিয়ার আক্রান্ত অসম্ভব মেধাবী একজন মানুষের বায়োপিক এই ছবিটি। এই ছবিতে সিজোফ্রেনিয়ার তৎকালীন চিকিৎসা-পদ্ধতির চিত্রটি আমরা ভালোভাবে দেখতে পাই; যেখানে দেখানো হয় ড. ন্যাশরূপী রাসেল ক্রোকে হাসপাতালের বিছানায় শুইয়ে হাত-পা বেঁধে দেয়া হয়। তারপর তার বাহুতে একটি ইনজেকশন দেয়া হয়। চারপাশে ঘিরে থাকে ডাক্তার, নার্স ও অন্য স্টাফদের একটি দল। রোগীর নেতিয়ে পড়তে পড়তে একসময় শুরু হয় তীব্র খিঁচুনি। পরে অন্যান্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে রোগী। এই চিকিৎসা পদ্ধতির নামই *ইনসুলিন কোমা থেরাপি*। আমাদের আজকের আলোচনা এটি ঘিরেই।

আবিষ্কার

অস্ট্রিয়ার তরুণ চিকিৎসক ডা. মেনফ্রেড স্যাকেল। ১৯২৫ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পর বার্লিনে যান উচ্চতর ডিগ্রির জন্য, ফিরে আসেন দুই বছর পর। ১৯২৭ সনে পুনরায় ভিয়েনাতে ফিরে এসে পুরোদমে প্র্যাকটিস শুরু করেন। তখন ঘটনাক্রমে একজন ডায়াবেটিক মানসিক রোগীকে ভুলক্রমে বেশি ডোজের ইনসুলিন প্রয়োগ করে দেখতে পান তার মানসিক উত্তেজনা অনেকটা কমে এসেছে। এই পর্যবেক্ষণ তাকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। তিনি এরপর যেসব মানসিক রোগীর ডায়বেটিস নেই তাদেরকেও বেশি ডোজের ইনসুলিন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করেন অন্যদের ক্ষেত্রেও এটি কাজ করছে এবং মানসিক উপসর্গের তীব্রতা কমে আসছে। এরপর ডা. স্যাকেল ধারাবাহিকভাবে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান। এতে আশাতীত ফলাফল লাভ করেন এবং বুঝতে পারেন যে তিনি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে।

বিস্তার

কয়েক বছরের সকল গবেষণার পর ১৯৩৩ সনে ডা. স্যাকেল তার গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করেন এবং ইনসুলিন কোমাথেরাপি প্র্যাকটিস শুরু করেন। রীতিমত হৈচৈ পড়ে যায়। দলে দলে বিভিন্ন চিকিৎসকদের ভিড় লেগে যায় নতুন এই চিকিৎসা-পদ্ধতি দেখার এবং নিজেদের দেশে তার প্রয়োগ ঘটানোর জন্য। ১৯৩৫ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রয়োগ শুরু হয়। প্রায় একই সময় ব্রিটিশ মনোরোগবিদদের একটি দল ভিয়েনা সফর করে এবং এ-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নেয়। ১৯৩৮ সালে দেখা যায় গোটা যুক্তরাজ্যে প্রায় ৩১টি ইনসুলিন কোমাথেরাপি ইউনিট চালু হয়। এগিয়ে চলে জয়রথ। একপর্যায়ে ডা. স্যাকেল অভিবাসী হয়ে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে এবং পূর্ণোদ্যমে শুরু করেন ইনসুলিন কোমাথেরাপি।

পদ্ধতি

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে শরীরে কিছু উপসর্গ তৈরি হয়। যেমন : ঝিমুনিলাগা, হাত-পা কাঁপা, ঘেমে যাওয়া ইত্যাদি। যদি গ্লুকোজের মাত্রা খুব বেশি কমে যায় তবে তীব্র আকারে এইসব উপসর্গ দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থাকে বলা হয় হাইপোগ্লাইসেমিক কোমা। উপযুক্ত সময়ের ভেতরে যদি রক্তের গ্লুকোজ স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়ে আনা যায় তবে রোগী সেই কোমা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন। ডা. স্যাকেল এই পদ্ধতিকেই কাজে লাগান। তিনি বাইরে থেকে বেশি মাত্রায় ইনসুলিন দিয়ে কৃত্রিমভাবে একটি হাইপোগ্লাই সেমিক কোমা তৈরি করেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর ইনজেকশন অথবা নাকের নলের মাধ্যমে শরীরে গ্লুকোজ প্রবেশ করিয়ে রোগীকে স্বাভাবিক করেন। ধারণা করা হয় মাঝখানে এই 'কোমা' অবস্থাটিই রোগীর মানসিক উপসর্গ কমানোতে ভূমিকা রাখে। মূলত সিজোফ্রেনিয়া চিকিৎসায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো। তবে অন্যান্য মানসিক রোগের চিকিৎসায়ও এই পদ্ধতি প্রয়োগের নজির রয়েছে। সাধারণত সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তদের সপ্তাহে ৫-৬ দিন করে অন্তত ২ মাস এই চিকিৎসা দিতে হতো। ক্ষেত্রবিশেষে আরো অধিক সময়ও দিতে হতো। তবে অন্যান্য নিউরোটিক রোগীদের ক্ষেত্রে আরো কম সময় লাগত।

উল্টোস্রোত

ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠে এই পদ্ধতি। গত শতকের চল্লিশের দশকের শেষদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে প্রায় সব মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রয়োগ করা হতো এই পদ্ধতি। যে-কোনো প্রক্রিয়ার উত্থান যেমন আছে তেমনি আছে পতনও। ১৯৫২ সালে Chlorpromazine আবিষ্কারের পর মানসিক চিকিৎসার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বাড়তে থাকে এর প্রয়োগ। প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যেতে থাকে ইনসুলিন কোমাথেরাপি। ১৯৫৩ সালে বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল *ল্যানসেট* প্রকাশ করে একটি আর্টিকেল যার নাম 'The Insulin Myth'। শুরু হয় নানাবিধ বিশ্লেষণ। এই থেরাপির বিপক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। ১৯৫৭ সালে *ল্যানসেট* আরেকটি গবেষণাধর্মী রেনডমাইজড কনট্রোলড ট্রায়াল প্রকাশ করে যেখানে এক দলের ক্ষেত্রে ইনসুলিন প্রয়োগ করে কোমা তৈরি করা হয়। আর একটি দলে বার বিচুয়েট প্রয়োগ করে কোমা তৈরি করা হয়। দেখা যায় দুই গ্রুপে ফলাফল প্রায় একই। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হয় চিকিৎসার ফলাফল পাওয়া যায় কোমা থেকে যেটা ইনসুলিন বা অন্য যে-কোনো কিছু দিয়েই তৈরি হোক না কেন। বদলাতে থাকে দৃশ্যপট। একদিকে নতুন নতুন ড্রাগ অন্যদিকে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অনুপস্থিতিতে কমতে থাকে এই পদ্ধতির প্রয়োগ। সত্তরের দশক নাগাদ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যদিও তখনো চীন, রাশিয়ায় প্রয়োগ চলতে থাকে এই পদ্ধতির।

পুরনো এক একটি চিকিৎসা পদ্ধতি আসলে এক একটি কালের স্বাক্ষর। বর্তমানকে জানতে হলে অবশ্যই ফিরে তাকাতে হবে অতীতের দিকে আর খুঁজতে হবে পদচিহ্ন–যে পথ ধরে অতীত থেকে এসে পৌঁছেছি বর্তমানে।

দুর্যোগ-দুর্ঘটনা

মনের ওপর প্রভাব

প্রত্যেক মানুষ নির্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব জীবন চায়, যেখানে শান্তি এবং স্বস্তিই কাম্য, কিন্তু না চাইলেও জীবনে চলার পথে নানাবিধ অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ কিংবা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। সারা পৃথিবী জুড়েই মিল-কারখানা, যানবাহন জলবায়ু আর প্রকৃতির নানা খেয়ালে হাজারো মানুষের জীবনে অসংখ্য দুর্যোগ হাজার রকমের দুর্ভোগ নিয়ে আসে। একটি হিসেবে দেখা গেছে, গত ২৫-৩০ বছরের প্রতি বছরে, গড়ে প্রায় ১৫ কোটি মানুষ কোনো না কোনো দুর্যোগের কারণে ভুক্তভোগী। এসব দুর্যোগের কারণে নানাবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব, উদ্বিগ্নতা, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা থেকে শুরু করে আরো ভয়াবহ মানসিক আঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় দুর্যোগ কবলিত মানুষ, তাদের পরিবারকে–মানসিক এসব সমস্যার জন্য সময়মতো সঠিক ব্যবস্থা না নিতে পারার কারণে। বিভিন্ন মানসিক ভোগান্তির মাত্রা দীর্ঘমেয়াদি এবং জটিল হতে পারে। কখনো কখনো মানুষের মানসিক সমস্যাগুলো শারীরিক সমস্যার মতোই বা তার চেয়েও বেশি ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ উদীয়মান অর্থনীতির দেশ–প্রাকৃতিক অবস্থান, জনসংখ্যার অধিক্য, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, বাসস্থান, আইন-শৃঙ্খলার অভাব ইত্যাদি অনেক কারণেই দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা যেন এখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার। দুর্যোগ-দুর্ঘটনা যে শুধু দৃশ্যমান ক্ষয়-ক্ষতিরই বিষয় নয়, মানসিকভাবেও মানুষকে অপূরণীয় মাসুল দিতে হয় সে বিষয়য়ে আমরা যথেষ্ট সচেতন না। তাই আমাদের দেশে দুর্যোগ-দুর্ঘটনার ফলে মানসিক ক্ষতিটা তলিয়ে দেখার, নিরুপণ করার বা প্রতিকার করার তৎপরতা নেই বললেই চলে। দুর্যোগে মনের অবস্থা এবং সেই সাথে মনের ওপর, পরিবারের ওপর, অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর পরবর্তী সময়ে কেমন প্রভাব ফেলে, সেসব নিয়ে এবারের মনো-সামাজিক বিশ্লেষণ। **ডা. সাদিয়া আফরিন**, রেসিডেন্ট, চাইল্ড এন্ড অ্যাডোলোসেন্ট সাইক্রিয়াট্রি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থায় মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে

অধ্যাপক ঝুনু শামসুন্নাহার
চেয়ারম্যান, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থায় বিভিন্ন রকম মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে; যেমন : যে-কোনো দুর্যোগের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে acute stress disorder, ১ মাস পরে হলে post traumatic stress disorder সহ, যে-কোনো দুর্ঘটনায় স্বজন হারানো, সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে ডিপ্রেশন, Anxietz disorder ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে। দেখা যায়, এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ অনেকেই পায় না বিধায় বাকি জীবন একরকম ট্রমার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়।

দুর্যোগ কবলিত স্থানে আমরা যে কাজটি করতে পারি তা হলো–সাইকোলজিকাল ফার্স্ট এইড দিতে পারি যেমন খাদ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ভিক্টিমদের সাথে তাদের স্বজন ও সামাজিক কানেক্টিভিটি বাড়ানো দরকার। কেননা, অনেকেই পরিবার-পরিজন হারিয়ে, শারীরিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিজেকে একা, অসহায়, আশাহীন মনে করে। যখন তারা একটু স্থিতিশীল হয় তখন ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করা যায় এবং এ সবকিছুই করতে হবে একটা টিমের মাধ্যমে। যেখানে সাইকিয়াট্রিস্টসহ সাইকোলজিস্ট, সমাজকর্মী, উদ্ধারকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী সবার সমন্বয়ে একটি সাইকোলজিকাল সাপোর্ট টিম গঠনের মাধ্যমে মানসিক বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব।

মানসিক ট্রমা থেকে পরিত্রাণের জন্য একটি টিম কাজ করছে

অধ্যাপক শাহীন ইসলাম
চেয়ারপার্সন, শিক্ষা ও কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিভিন্ন দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট মানসিক ট্রমা বা আঘাত বা সমস্যা যা-ই বলি না কেন এ থেকে পরিত্রাণের জন্যে বাংলাদেশে একটি টিম কাজ করছে। সুইজারল্যান্ডের *Trauma Aid* এই দলকে ট্রেনিং দিয়েছে। সুতরাং বলতে পারি এই ধরনের মানসিক ট্রমা থেকে পরিত্রাণের জন্য এখন বাংলাদেশেজুড়ে একটি টিম আছে, তারা কাজ করছে। যেখানে ব্যক্তিগতভাবে কাজ হচ্ছে, সেগুলোও প্রচার করতে হবে। তাহলে মানুষজন জানবে যে, দুর্যোগ পরবর্তী মানসিক আঘাত থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলো। কোনো Traumalized Client হলে EMDR এখন WHO কর্তৃক Recognized একটা Therapy, সেখানে আমরা কাজ করছি। এই EMDR কে Validate করার জন্য একটা প্রজেক্ট নিয়েছি আমি Ministry of Education থেকে। প্রজেক্টের আওতায় রোহিঙ্গাদের ওখানে গিয়ে
Self-care এর কাজটা করে এসেছি। ওখানে রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা Traumalized তারা বা তাদের পরিবার নয়, যারা Responder তারাও সেকেন্ডারি ট্রমাটাইজড/Secondary Victim, তাদের Self-Care এর জন্য কাজ করছি। দুর্ঘটনা-দুর্যোগ পরবর্তী মানসিক Trauma এর ওপর কাজ করার জন্য এ ধরনের টিম সত্যিকারের জায়গা এবং এ ধরনের কাজগুলো সাধারণ মানুষের সামনে আসা উচিত মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য।

সচেতনতা সৃষ্টিতে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে

মামুনুর রশীদ
নাট্যব্যক্তিত্ব।

যে-কোনো দুর্যোগের কারণেই মানুষের ওপর ভয়াবহ মানসিক চাপ পড়তে পারে। এর কারণ হলো দুর্যোগ প্রায় সময়ই আচমকা সংঘটিত হয়, যার জন্য কোনো পূর্বপ্রস্তুতি থাকে না, এমনকি সেই দুর্যোগের প্রকার, কারণ, প্রতিরোধ, প্রতিকার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা থাকে না সাধারণ মানুষের। এক্ষেত্রে মিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে। যেমন : বাংলাদেশ টেলিভিশনে এখন একটা টিভিসি যাচ্ছে বজ্রপাতের সময় কী করণীয়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে বজ্রপাত নিয়ে এক রকম আতঙ্ক বিরাজ করে, এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য জানা থাকলে, করণীয় সম্পর্কে অবগত থাকলে পরবর্তী মানসিক চাপ থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে। আবার শহুরে জীবনে যেমন : ভূমিকম্প, ঝড় নিয়ে একটা বড় আতঙ্ক কাজ করে। সেক্ষেত্রেও একইভাবে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে। মানসিক স্বাস্থ্যগত যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে সম্পর্কেও ধারণা দেয়া যেতে পারে। কারণ তাহলে দুর্যোগ পরবর্তী মানসিক বিপর্যয়গুলো সম্পর্কে মানুষের ধারণা তৈরি হবে। তবে অবশ্যই যদি দুর্যোগের ফলে ব্যক্তি, পরিবার মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, এইসব মানসিক সমস্যা চিহ্নিত করে সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হওয়া উচিত মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার জন্য।

যারা খবরটা দেখছেন বা পড়ছেন এরাও বিপর্যস্ত হতে পারেন

তুষার আবদুল্লাহ
গণমাধ্যম-কর্মী।

আমাদের জন-জীবনে নানারকম দুর্যোগের নানারকম প্রভাবের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। নদী-ভাঙন বা বন্যায় নদীর পাড়ে বসবাস যাদের প্রতি বছরই দেখা যায় তাদেরকে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এসব পরিবারের নারী, পুরুষ, শিশুদেরকে নির্বিশেষে অপূরণীর ক্ষতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যেমন : জীবন ও জীবিকার অনিশ্চয়তা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও চিকিৎসা নিয়ে নিরাপত্তাহীনতা–যা তাদের যাপিত জীবনকে এক প্রকার হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এটা একধরনের প্রভাব। আবার কোথাও আগুন লাগল, ঘর-বাড়ি কিংবা মানুষ আহত-নিহত হলো, সেখানকার মানুষদের মধ্যে ভয়াবহ আতঙ্ক বিরাজ করে, যারা এ ধরনের দুর্যোগের প্রত্যক্ষদর্শী তাদের মধ্যেও দীর্ঘদিন মানসিক আতঙ্ক কিংবা আশঙ্কা কাজ করে। আবার সড়ক কিংবা বিমান দুর্ঘটনার ফলে যে প্রভাব পড়ে, তারা ঐসব যানবাহন ঐসব রাস্তা পুনরায় ব্যবহার করতে প্রচণ্ড ভয় পান। মোট কথা, জাতীয় ও সামাজিক জীবনে একটা বিশৃংঙ্খলা তৈরি হয়। গণমাধ্যম যখন এসব দুর্যোগ-দুর্ঘটনার খবর ফলাও করে ছবিসহ ছাপায় তখন স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনা কবলিত মানুষদের মধ্যে যে আতঙ্ক কিংবা অস্থিরতা থাকে তা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে সবচেয়ে খারাপ প্রভাব পড়ে ব্যক্তিগত কোনো দুর্ঘটনায়। যেমন : সড়ক-বিমান-নৌযান দুর্ঘটনা, ধর্ষণ যখন সার্বজনীন করে ফেলা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই আক্রান্ত মানুষকে নানারকম অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যা তাদের জন্য উপর্যুপরি মানসিক আঘাত। কারণ হয়তো তারা সেই ভয়াবহ ঘটনা আর মনে করতে চাচ্ছেন না। ভুলে যেতে চাচ্ছেন। আবার যারা এই খবরটা দেখছেন বা পড়ছেন ঘটনায় ভয়াবহতায় এরাও বিপর্যস্ত হতে পারেন। বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, নারীরা। অনেকেই সহজে মেনে নিতে পারেন না তাই তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অথবা একটি ঘটনা দেখে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঐরকম কোনো দুর্ঘটনা নতুন করে মনে পড়ে যাওয়ায় মানসিক আঘাত পেতে পারেন। গণমাধ্যম কর্মীদেরও একটি প্রতিযোগিতার মনোভাব–কতটা তাড়াতাড়ি কতটা নিবিড়ভাবে দুর্যোগ-দুর্ঘটনার খবর সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেটাই প্রাধান্য পায়। কিন্তু দুর্ঘটনা কবলিত মানুষগুলোর মানসিক অবস্থার খবর দুঃখজনক হলেও সত্যি আমরা মনে করি না। এজন্য আমার মনে হয় নৈতিক এবং মানবিক অবস্থান থেকে আমাদের নিজেদের বেশি সচেতন হওয়া উচিত দুর্যোগ পরবর্তী মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর, বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ওপর।

মানসিক আঘাতের উত্তরণের পথ অনেকেরই অজানা

শাহরিয়া জেবিন
শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দুর্যোগ সেটা মানবসৃষ্ট কিংবা প্রাকৃতিক যেটাই হোক না কেন, আমি মনে করি বেশিরভাগ দুর্যোগের পেছনে কার্যকারণ থাকে এবং সেই কার্যকারণের বেশিরভাগই আমাদের সৃষ্টি। প্রকৃতির যথেচ্ছ ব্যবহার, দূষণ, নিয়ম না মেনে বন উজাড় করে ফেলা থেকে শুরু করে নাগরিক জীবনে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি কারণেই আমাদের জীবনে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে এবং এসব দুর্ঘটনা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে অভাবনীয় ক্ষতির সম্মুখীন করে। ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। সাজানো জীবন হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় অনেক মানুষই হতাশ হয়ে পড়ে।

সাধারণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি যে, যে-কোনো দুর্ঘটনা একজন ব্যক্তি এবং তার পরিবারকে চরম মানসিক আঘাতের সম্মুখীন করে যা থেকে উত্তরণের পথ অনেকেরই অজানা।

মাঝে মাঝে মনে হতো জীবন দিয়ে দেই

নাম ও পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন এসিড সারভাইভরস্

আমার যে অবস্থা হয়েছিলো, তাতে বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। যা হোক বেঁচে গেলাম। কিন্তু চোখ ও মুখের কিছু অংশ আর ডান হাতের আঙ্গুলগুলো আর ঠিক হয়নি। এখন এই অবস্থায়ই আছি। ঠিকমতো কাজ করতে পারি না। বিয়ে করার কথা আর ভাবি না। নিজের জীবন কোনোরকম পার করতে পারলেই খুশি। রাগ হয়, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা হয়। আবার ভাবি, আমি তো ওর মতো খারাপ না। মানুষ যখন আমার দিকে তাকিয়ে কিছু বলে, তখন খারাপ লাগে। আগে আরো বেশি খারাপ লাগতো। এখন অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হতো, জীবন দিয়ে দিই। চিকিৎসা নিয়েছি, এখন অনেকটা স্বাভাবিক আছি। তবে চেনা মানুষের সামনে যেতে এখনো ভালো লাগে না।

মনোসামাজিক বিশ্লেষণ

দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা দুটোই আমাদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধযোগ্য। তারপরও দুর্যোগ পরবর্তী মানসিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে যথাযথ ধারণা থাকলে, সময়মতো প্রতিরোধযোগ্য ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অধিকাংশ মানসিক সমস্যাই মোকাবেলা করা সম্ভব–এরকমটাই উঠে এসেছে এই বিশ্লেষণে।

নানারকম দুর্যোগের নানারকম প্রভাব থাকলেও মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো মোটামুটি একই ধরনের। হয়তো তার মাত্রা ভিন্ন, কিংবা ব্যক্তিভেদে পরিবর্তনশীল। দুর্যোগের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে শুরু করে দুর্যোগ পরবর্তী (দিন/মাস) নানারকম মানসিক সমস্যা দেখা দেয়, যেমন : ভয়, আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা, হতাশা, বিষণ্নতা, লোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডারসহ অস্থিরতা, অনুশোচনা, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, সন্দেহ-পরায়ণতা এমনকি আক্রমণাত্মকও হয়ে ওঠা। শুধুমাত্র ভুক্তভোগীরাই নয়; যারা উদ্ধারকর্মী, রিলিফদানকারী, প্রত্যক্ষদর্শী এদের মধ্যেও এমন সব মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। মেডিক্যাল এমনকি মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী যারা Primary বা Secondary-এর সাথে অনেকদিন কাজ করে থাকেন তাদেরও বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

দুর্যোগের ভয়াবহতা বা দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নিয়ে মিডিয়া বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রচারের সময় বিশেষ কিছু বিষয় মনে রাখা উচিত। কতটুকু প্রচার করব, সেটাও একটি বিষয়। অনেক সময় দুর্যোগের আঘাত–কর্মক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সাইকোলজিস্ট উভয়ই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে পারে যা আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে। দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য বা Self-care নিয়ে এখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদারগণ কাজ করছেন, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। সুতরাং কোনো একটি দুর্যোগের পর সেখানকার অবস্থা দ্রুত বুঝে নেয়া এবং সেই সাথে আক্রান্ত মানুষের মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করা আমাদের দায়িত্ব। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় কাজটিতে মনোযোগ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। সেই সাথে পরবর্তী জীবন ধারণের ক্ষেত্রেও যাতে এসবের প্রভাব কম থাকে। মানসিক-সেবার ধরন ও প্রয়োগ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমেই ঠিক করা উচিত। ঔষধ, কাউন্সিলিং, সাইকোথেরাপি, রিলাক্সেশনসহ আরো অনেক বিষয় আছে যা যথাযথভাবে নির্ণয় করাও বিশেষজ্ঞের কাজ। ব্যক্তি, পরিবার নিয়েই সমাজ। তাই সামাজিক ও জাতীয়ভাবে যদি দুর্যোগ পরবর্তী মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয় তাহলে দুর্ঘটনা কবলিত মানুষ ও তাদের পরিবারকে যে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

DRUG OF CHOICE

RESIDON®
Risperidone
1 mg, 2 mg &
4 mg tab.

Qutap®
quetiapine
25 mg &
100 mg tab.

for better QOL

mirez®
Mirtazapine
15 mg &
30 mg tab.

BETTER RESPONSE WITH EXCELLENT TOLERABILITY

Healthcare Pharmaceuticals Limited
Nasir Trade Centre (Level-9 & 14), 89 Bir Uttam C.R. Datta Sarak, Dhaka-1205, Tel: (02) 9632176

অটিজমের সাথে অন্যান্য রোগের সম্পর্ক

বিএসএমএমইউতে সেমিনার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অটিজমের সাথে অন্যান্য রোগের সম্পর্ক নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. মিলন সভাকক্ষে 'সাইকিয়াট্রিক কো-মরবিডিটিস : দ্যা হিডেন আইসবার্গ অব অটিজম' শীর্ষক এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের এডিএসডি ক্লিনিক এই সেমিনারের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. শাহানা আখতার রহমান। সভাপতিত্ব করেন মনোরোগবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. ঝুনু শামসুন্নাহার।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল অটিজম আক্রান্ত শিশুর অভিভাবকের অভিজ্ঞতা বিনিময়। মনোরোগবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় ছিল অটিজম নিয়ে একটি নাটিকা। অনুষ্ঠানে অটিজম নিয়ে ছিল ৩টি প্রেজেন্টেশন। ডা. রেদওয়ানা হোসেন, ডা. তৈয়বুর রহমান রয়েল এবং ডা. নিয়াজ মুহাম্মদ খানের প্রেজেন্টেশনগুলোতে উঠে এসেছে অটিজম চিকিৎসার নানা দিক।

এছাড়াও ছিল প্যানেল ডিসকাশন। আলোচনায় অংশ নেন মনোরোগবিদ্যা বিভাগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও ডাক্তারগণ।

অধ্যাপক ডা. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক ডা. এম এস আই মল্লিক, অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল, ডা. শামসুল আহসান মাকসুদ, ডা. সিফাত, অধ্যাপক ডা. নাহিদ মাহজাবিন, ডা. হাফিজুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. সালাহ্উদ্দিন কাউসার বিপ্লব প্যানেল ডিসকাশনে অংশ নেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অধ্যাপক ডা. শাহানা আখতার রহমান বলেন, 'অটিজম শিশুর ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সেমিনারে অটিজম নিয়ে বেশ কিছু জরুরি কথা উঠে এসেছে। অটিজমে আক্রান্ত শিশুর যৌনস্বাস্থ্য নিয়ে আরো গবেষণা হোক।'

মনোরোগবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. ঝুনু শামসুন্নাহার বলেন, 'এপ্রিল মাসে অটিজম দিবস। এই দিবসকে সামনে রেখে আমরা একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এবারের অটিজম দিবসের স্লোগান অটিজমে আক্রান্ত মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। অটিজমে আক্রান্ত মেয়েরা প্রচুর যৌন হয়রানির শিকার হয়, এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।'

এডিএইচডি ক্লিনিকের কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ডা. নাহিদ মাহজাবিন মোরশেদের সমন্বয়ে সার্বিক অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করেছে ইউনিমেড ইউনিহেলথ।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে অটিজম দিবস উপলক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক সেমিনার

২ এপ্রিল ছিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। এ উপলক্ষ্যে ৩ এপ্রিল জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথ (বিএসিএএমএইচ) যৌথভাবে এই বৈজ্ঞানিক সেমিনারের আয়োজন করে। সহায়তা করেছে ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস। 'অটিজম : এডভোকেট এডুকেট লাভ একসেপ্ট' টপিক নিয়ে ছিল এই সেমিনার।

আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজে অটিজম বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সেমিনার

এপ্রিল মাস অটিজম সচেতনতার মাস। সারা বিশ্বে এ মাসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টসের (বিএপি) উদ্যোগে আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজে ১৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে অটিজম নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আজিজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টসের সভাপতি ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. ওয়াজিউল আলম চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ডিজি এম এস মেজর জেনারেল মুন্সী মোহাম্মদ মজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল ফসিউর রহমান এনডিসি, নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজাবিলিটি প্রটেকশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. গোলাম রাব্বানী, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফারুক আলম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. ঝুনু শামসুন্নাহার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা. এম এ মোহিত কামাল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টসের বৈজ্ঞানিক সম্পাদক ডা. মেখলা সরকার। অনুষ্ঠানে সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন হাসপাতালের শিক্ষক, ডাক্তার ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের ছবি নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনী

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ছিল ২ এপ্রিল। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে একাদশ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৪-৭ এপ্রিল চারদিনব্যাপী অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের যাপিত জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের ছবি নিয়ে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরো ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা)'র উদ্যোগে সকলের জন্য উন্মুক্ত এ প্রদর্শনী হয়। এতে স্থান পেয়েছে শতাধিক ছবি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট আলোকচিত্রী শংকর শাওজাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরো ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা)'র প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. শাহীন আখতার। প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেছেন, 'অটিজম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিশুরা হচ্ছে অসাধারণ শিশু। আমি এ শিশুদের দেখি বিস্ময়ের সঙ্গে। তারা যা সৃষ্টি করতে পারে, আমরা তা পারি না। তারা যে জগতে বাস করে, তা আমাদের কাছে অচেনা। তাই আমরা মনে করি, ওরা স্বাভাবিক নয়।'

সংস্কৃতিমন্ত্রী আরো বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সুযোগ্যা কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল অটিজম বিষয়ে বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। অটিস্টিক বাচ্চাদের নিয়ে অভিভাবকদের লজ্জা ও অপরাধবোধ এখনো বিরাজমান। ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। তবে কিছুটা সময় লাগবে। অটিস্টিক শিশুদের মানুষ করার পুরোপুরি উপযুক্ত পরিবেশ আমাদের দেশে এখনো তৈরি হয়নি। সামাজিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধ থেকে এ পরিবেশ তৈরিতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। সত্যিকার অর্থে এ অসাধারণ শিশুদের সহায়তা করতে পারে এমন প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়ে তুলতে হবে, যারা পেশাগত দক্ষতা, সততা ও মমত্ববোধ থেকে এ দায়িত্ব পালন করে যাবে।'

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চার্চের আয়োজন

দিন দিন বাড়ছে মানসিক রোগ। এ বিষয়ে প্রয়োজন সচেতনতা। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে এগিয়ে এসেছে চার্চ। জাতীয় চার্চ পরিষদ বাংলাদেশের মহিলা বিভাগ ২০ এপ্রিল ইস্কাটনে তাদের কার্যালয় এনসিসিবি কনফারেন্স রুমে 'মানসিক স্বাস্থ্য ও আমাদের পরিচর্যা' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে মানসিক সমস্যার নানা দিক নিয়ে কথা বলেন ডা. মো. ওয়ালিউল হাসনাত সজীব।
মানসিক রোগের পরিচর্যা ও চিকিৎসা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডা. সৃজনী আহমেদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহিলা বিষয়ক সচিব ডেইজি রয়।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিটিউটের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিটিউটের ১৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হলো গত ১৮ এপ্রিল। ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।
প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পর এবারই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ইন্সিটিউটের প্রাঙ্গন সকাল থেকেই অতিথিদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির প্রাক্তন পরিচালকবৃন্দ, প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপকগণ, প্রশিক্ষণার্থীগণ ও সকল চিকিৎসক, সেবিকা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ মেডিক্যালে ক্লিনিক্যাল সেমিনার

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মানসিক স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট একটি ক্লিনিক্যাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯ এপ্রিল ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কনফারেন্স কক্ষে 'সাইকিয়াট্রিক আসপেক্ট অব মেডিক্যালি আনএক্সপ্লেইনড সিম্পটমস' শীর্ষক সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজনে সহযোগিতা করেছে জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস।
ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন মনোরোগবিদ্যা বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার।

গুরুতর মানসিক রোগীদের নিয়ে জরিপ

গুরুতর মানসিক রোগীদের মাঝে অন্যান্য রোগের প্রকোপ বিষয়ে একটি জরিপ চলছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অর্থায়নে এ জরিপটি পরিচালনা করছে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল (NCDC)।
দেশের যেসব হাসপাতালে মনোরোগের ইনডোর ও আউটডোর রয়েছে, এমন ১৩টি হাসপাতালে চলছে এই জরিপ কার্যক্রম। জানুয়ারিতে শুরু হওয়া এই জরিপ চলবে জুন পর্যন্ত। 'কো-মরবিলিটি এমং পেশেন্টস উইথ সিভিয়ার মেন্টাল ইলনেস' শিরোনামে এই জরিপটি পরিচালিত হবে ২০৫২ জন রোগীর উপর।

নেশার প্রকোপ ও মানসিক রোগ নিয়ে জরিপ

দেশব্যাপী চলছে 'নেশার প্রকোপ ও মানসিক রোগ নিয়ে জরিপ' কার্যক্রম। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অর্থায়নে এ জরিপটি বাস্তবায়ন করছে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল (NCDC)। 'প্রিভিলেন্স অ্যান্ড রিস্ক ফ্যাক্টরস অব সাবস্ট্যান্স ইউজ ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে এই জরিপটি শুরু হয়েছে জানুয়ারিতে। সারাদেশে শহরে ও গ্রামে এই জরিপটি পরিচালনা করা হবে ১৯৮০০ জনের উপর। দেশের ১৪০টি স্থানে এই জরিপ পরিচালিত হবে। এই ১৪০টি গুচ্ছের প্রতিটিতে ১৪২ জনের উপর জরিপ করা হবে। প্রতিটি গুচ্ছে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ২০ জন করে তথ্য সংগ্রাহক।

হতাশা ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে বিটিএফের আয়োজনে কাউন্সেলিং কর্মশালা

ব্রাইটার টুমোরো ফাউন্ডেশন (বিটিএফ)-এর আয়োজনে ৮ এপ্রিল হতাশা ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে একটি কাউন্সেলিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে দিনব্যাপী এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ কর্মশালায় টেকনিক্যাল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়াও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান এবং উত্তরা উইমেন মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. চিরঞ্জীব বিশ্বাস কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় প্রায় ৪০ জন শিক্ষক, চিকিৎসক, গৃহবধূ, ব্যবসায়ী এবং মেডিক্যাল ও সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশ নেন।
অধ্যাপক হেলাল তাঁর প্রবন্ধে বলেন, 'নিজের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলেই সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলা সম্ভব।'

বিএপির এজিএমে মিলনমেলা তিন কথাসাহিত্যিককে সম্মাননা

কথাসাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনজন মনোচিকিৎসককে সম্মাননা প্রদান করেছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টস (বিএপি)। সম্মাননা পেয়েছেন বাংলাদেশের অন্যতম তিন কথাসাহিত্যিক ও মনোচিকিৎসক অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক, অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল ও অধ্যাপক ডা. মামুন হুসাইন। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্টসের (বিএপি) ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৯ এপ্রিল।

সাভারের ব্রাক সিডিএমে অনুষ্ঠিত এ সভায় তিনজনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। দিনব্যাপী এ বার্ষিক সভায় আলোচনার বাইরেও ছিল গেমস, র‍্যাফেল ড্রসহ বর্ণাঢ্য আয়োজন। সংগঠনের সাথে যুক্ত সাইকিয়াট্রিস্টসগণ সারা দেশ থেকে এসে এই সাধারণ সভায় যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্টসের কোষাধ্যক্ষ ডা. অভ্রদাশ ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল এবং সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. ওয়াজিউল আলম চৌধুরী। বক্তাদের আলোচনায় নবীন মনোচিকিৎসকদের চাকরি নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উঠে এসেছে। এছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ডা. বুশরা সুলতানা ও ডা. ওয়ালিউল হাসনাত অনুষ্ঠানে একাডেমিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সম্মাননা প্রাপ্ত আনোয়ারা সৈয়দ হক একজন খ্যাতনামা বাংলাদেশি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক ও কথাসাহিত্যিক। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্যসহ তার অধিকাংশ রচনায় একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন। তিনি ২০১০ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের সহধর্মিণী। সম্মাননাপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল ১৯৬০ সালের ২ জানুয়ারি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি ১৪১৮ বঙ্গাব্দের জন্য সম্প্রতি অগ্রণী ব্যাংক-শিশু একাডেমি শিশুসাহিত্য অর্জন করেছেন। পেশাজীবনে তিনি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক (হেড অব সাইকিয়াট্রি, একাডেমিক কোর্স ডিরেক্টর, এমডি/রেসিডেন্সি, সাইকিয়াট্রি)।

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কলাম, কিশোরদের উপযোগী গল্প, কিশোর উপন্যাস, বিজ্ঞান ও গবেষণাসহ নানা বিষয়ে লেখালেখিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি। তার মোট বইয়ের সংখ্যা ৪৭টি। এর মধ্যে কথাসাহিত্য ২৭টি, শিশু-কিশোর বিষয়ক ১০টি, অন্য বইগুলো মনস্তত্ত্ব বিষয়ক। ইতোমধ্যে তিনি পেয়েছেন সিটি আনন্দ আলো সাহিত্য পুরস্কার ২০১৪, এম নুরুল কাদের ফাউন্ডেশন শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০১২ সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার । পুরস্কারপ্রাপ্ত 'উড়াল বালক' কিশোর উপন্যাসটি স্কলাস্টিকা স্কুলের গ্রেড সেভেন ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি (SEQAEP) কর্তৃক ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্য হিসেবে রয়েছে।

সম্মাননা প্রাপ্ত আরেক কথাসাহিত্যিক মামুন হুসাইনের জন্ম ১৯৬২ সালে কুষ্টিয়া জেলা সদরে। বর্তমানে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। ২০০৪ সালে পেয়েছেন কাগজ সাহিত্য পুরস্কার। 'নিক্রপলিস' উপন্যাসের জন্য ২০১১ সালে পেয়েছেন 'বাঙলার পাঠশালা- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পুরস্কার'। সম্প্রতি তিনি গ্রহণ করেছেন কথাসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার-২০১৭। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে– 'শান্ত সন্ত্রাসের চাঁদমারি', 'মানুষের মৃত্যু হলে', 'কয়েকজন সামান্য মানুষ', 'বালকবেলার কৌশল', 'নিরুদ্দেশ প্রকল্পের প্রতিভা, 'নিক্রপলিস', 'হাসপাতাল বঙ্গানুবাদ' ইত্যাদি।

হালকা উল্টাপাল্টা কাজে বা কথায় প্রচণ্ড মানসিক চাপ বোধ করি

আমার বয়স ২৫-৩৫-এর মধ্যে। আমি নাম বলতে ইচ্ছুক নই। বাবা মারা গেছেন ছোটবেলায়। দেখিনি কখনো। শুধু ছবি দেখেছি। মা আর তিন মামার সাথে বেড়ে ওঠা আমার। তারা স্বাধীনচেতা মানুষ। পরিবারে কিছু ঝগড়া হয়। তবে সিরিয়াস না। আমার ডায়াবেটিস আছে। তবে ব্ল্যাড সুগার খালি পেটে ৬-এর বেশি ওঠে না। ব্ল্যাড প্রেসার নেই। মাসিকের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, তবে থাইরয়েডের কারণে না। বেশি মোটা হয়ে যাওয়ার কারণে। আমার শ্বাসকষ্ট আছে। তবে সিরিয়াস না। মাঝখানে ২০১০ সালে আমার বিয়ে হয়। তবে স্বাভাবিক ছিল না। মেনে নিতে না পারায় ৩ মাসের মাথায় আমি ডিভোর্স দেই। তারপর থেকে প্রায় ১-২ বছর ভালোই ছিলাম। বর্তমানে চাকুরির খাতিরে মা আর মামাদের থেকে দূরে থাকি। রুমমেট আছে ২ জন। তারাও হেল্পফুল না। কথায় কথায় ঝগড়া। যে কারণে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি। কিন্তু বেশি পারি না কারণ তারা আমার অফিসে সহকর্মী। যেসব হালকা উল্টাপাল্টা কাজে বা কথায় আমি আগে মাথা ঘামাতাম না সে কথাগুলোয় ইদানীং প্রচণ্ড মানসিক চাপ বোধ করি। কী করব বুঝতে সমস্যা হয়। কাকে বিশ্বাস করা উচিত আর কাকে না সেটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমাকে কেউ ভালোবাসে না সেই দুঃখ তো আছেই। কথায় কথায় খুব কান্না পায়। কাঁদিও অনেক। তবে চুপি চুপি। লুকিয়ে। খুব অস্থির হয়ে পড়ি। অনেক ক্ষেত্রে রাগারাগিও করি বেশ কিছুটা। কে আপন আর কে পর তা না বুঝেই। অথচ আগে এমনকি ২০১২ বা ২০১৩ সালেও আমি এরকম ছিলাম না। আমি দৃঢ়চেতা ও শক্ত মনের মানুষ হতে চাই আবার। যা আমি আগে ছিলাম।

পরামর্শ দিয়েছেন
অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা বেগম
মানসিক বিভাগ
বারডেম ও ইব্রাহিম মেডিক্যাল কলেজ।

অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা বেগম :
আপনার প্রশ্ন পড়ে মনে হচ্ছে আপনার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়ে মামাবাড়িতে মানুষ হয়েছেন। কিন্তু এই মামাদের আপনার বাবার জায়গায় বসাতে পেরেছেন কিনা বা মামাদের কাছ থেকে বাবার মতো আদর পেয়েছেন কিনা তা স্পষ্ট বোঝা গেল না। আপনার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সেটা মেনে নিতে পারেননি বলে ডিভোর্স দিয়ে চলে এসেছেন এবং এখন চাকরির জন্য পরিবার থেকে আলাদা থাকছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে আপনার মধ্যে যথেষ্ট সাহস ও মনোবল ছিল। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক সেটা এখন কমে যাওয়াতে আপনার মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। আর এজন্যই আপনার মধ্যে মানসিক চাপবোধ, কথায় কথায় কান্না করা, অস্থিরতা–এই সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে। আপনার রুমমেটদের সাথেও আপনার সম্পর্ক খুব একটা ভালো না। হয়তো আপনি শেয়ার করার মতো কাউকে পাচ্ছেন না বলেই আপনার মধ্যে এক ধরনের একাকিত্ব বোধের সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ মুহূর্তে আপনার জীবনে এমন একজনকে প্রয়োজন যার সাথে আপনি সব কথা শেয়ার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি মনের মতো মানুষ খুঁজে নিতে পারেন। আর যদি এ ধরনের কোনো সম্পর্কে জড়াতে না চান তবে অন্তত পক্ষে একজন বন্ধুকে কাছে রাখতে পারেন যার ওপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন এবং যার সাথে আপনার মনের সব কষ্ট শেয়ার করতে পারেন। কারণ, জীবনে কখনো একা চলা যায় না। মানুষ যখন নিঃসঙ্গ থাকে তখন মনে বিভিন্ন ধরনের আজেবাজে চিন্তা আসতে পারে। আর আপনার মনের মধ্যে একটা কষ্ট আছে যে কেউ আপনাকে ভালোবাসে না। এটা কি নিছকই আপনার মনের ভুল নাকি এর পেছনে কোনো কারণ আছে সেটা ভেবে দেখা দরকার। আপনি বিয়েটা মেনে নিতে পারেননি বলে ডিভোর্স দিয়ে চলে এসেছেন কিন্তু ঠিক কী কারণে মেনে নিতে পারেননি সেটা কি আপনি সবাইকে বোঝাতে পেরেছেন? আসলে আমাদের সমাজে একটা মেয়ে ডিভোর্স দিলে সেটা কেউ ভালোভাবে নেয় না। হয়তো আপনার মুরুব্বিরাও এটা মেনে নিতে পারেননি বলে আপনার সাথে তাদের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তাই আপনার উচিত হবে আপনার ডিভোর্সের যথার্থ কারণগুলো সবাইকে বুঝিয়ে বলা। সবাই আপনাকে ভালোবাসে ঠিকই কিন্তু সেটা হয়তো আপনি বুঝতে পারছেন না। আর তাছাড়া কে আপনাকে ভালোবাসলো সেটা না ভেবে আপনি কাকে কতটা ভালোবেসেছেন সেটা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? আপনি যদি কাউকে ভালোবাসা দিতে পারেন তবে আপনিও কারো থেকে ভালোবাসা পেতে পারেন। তাই আপনি আগে ভেবে দেখেন আপনি জীবনে কাকে কী দিয়েছেন আর জীবনের কাছ থেকে আপনার কী চাওয়ার আছে। আশা করি, আপনার চাওয়া-পাওয়াগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেই আপনার জীবনে স্বস্তি ফিরে আসবে এবং কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন।

মনে হয় আমি কোনোদিনই ভালো হবো না

আমি দীর্ঘদিন ধরে একটা সমস্যায় ভুগছি। আমার মাঝে চরম আকারে অপরাধবোধ কাজ করে। অতীতের বিভিন্ন ভুলের জন্য নিজেকে অনেক অপরাধী মনে হয়। আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়া না পাওয়ার বিষয়ে হতাশায় ভুগি। জানি আল্লাহ দয়াশীল। তারপরেও মনে হয় আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমা না করেন? চাই না এমন চিন্তা মনের মধ্যে আসুক। কিন্তু সবসময় এটা মনে করে প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভুগি। মনে হয় আমি কোনোদিনই ভালো হবো না। আসলে আমার এ রোগের নাম কী?

–নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

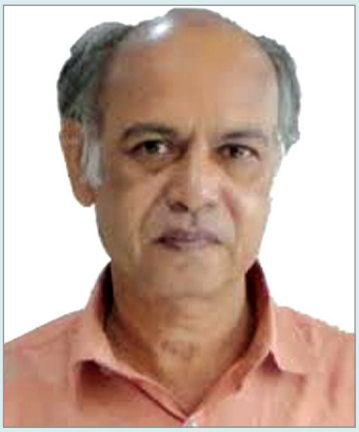

পরামর্শ দিয়েছেন
অধ্যাপক ডা. খসরু পারভেজ
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ,
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

অধ্যাপক ডা. খসরু পারভেজ : আপনি বিষণ্নতা নামক মানসিক রোগে ভুগছেন। এ রোগটা শরীরের প্রাণরসায়ণগত সমস্যা অথবা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার কারণে হয়ে থাকে। এ রোগের জন্য বিষণ্নতা-বিরোধী ঔষধ এবং সাইকোথেরাপির প্রয়োজন। আপনার এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে নিকটস্থ মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

অনেক চেষ্টা করেও মন থেকে ভাবনা বাদ দিতে পারছি না

আমি মো. আসাদুজ্জামান। আমি গত ৩ বছর যাবৎ একটা মানসিক সমস্যায় ভুগছি। আমার সমস্যা হচ্ছে–আমার মনের ভেতর সবসময় একটা চিন্তা-ভাবনা থাকেই। আমি যখন কোনো একটা জিনিস দেখি তখন সেটি নিয়ে ভাবতে থাকি। যেমন : আমি একটা মোটরসাইকেল দেখলাম সেটা নিয়েই ভাবতে থাকি। আমি অনেক চেষ্টা করি এইসব চিন্তা না করার কিন্তু কিছুতেই এইসব বাজে চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিতে পারি না। আবার এখন যে সমস্যা বেশি হচ্ছে সেটি হলো–আমার মনের ভেতর সব সময় একটা চাপ হচ্ছে এবং আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো হচ্ছে এবং বুকে ব্যথা হচ্ছে। অনেক সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখছি; নিজেকে বোঝাচ্ছি যে, এসব চিন্তায় কোনো লাভ নেই এতে আমার বুকে চাপ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও মন থেকে এই ভাবনা বাদ দিতে পারছি না। দয়া করে পরামর্শ দেবেন আমি কীভাবে ভালো হতে পারি।

অধ্যাপক ফারুক আলম : আপনার সমস্যা থেকে মনে হচ্ছে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রোগ যাকে আমরা বলি Obsession বা Obsessive Compulsive Disorder-এ আক্রান্ত। এই রোগে একই চিন্তা, একই কথা, একই কাজ মাথায় বারবার আসে এবং যখন কারো মাথায় চিন্তাগুলো আসে সে সেগুলো সরানোর চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। ফলে তার মাথা এবং শরীরে চাপ পড়ে, কষ্ট হয় এবং তখন তার মধ্যে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ দেখা দেয়–মাথা ব্যথা, বুক ব্যথা, অস্থিরতা, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি। এই রোগের চিকিৎসা দুই ধরনের–একটি হলো ঔষধ ছাড়া চিকিৎসা এবং আরেকটি হলো ঔষধসহ চিকিৎসা। ঔষধ ছাড়া চিকিৎসায় রয়েছে Thought Stopping, Exposure Response Prevention ইত্যাদি। Psycho-education, Counseling

পরামর্শ দিয়েছেন
অধ্যাপক ফারুক আলম
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও পরিচালক,
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

এগুলোও দরকার এবং এই চিকিৎসা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণ করে থাকেন। কিছু ঔষধ আছে যেগুলো আমরা দিয়ে থাকি। এগুলো শুধু Advice দিয়ে হবে না। আপনাকে কোনো মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সাথে কনসাল্ট করতে হবে। আপনার সমস্যার আরো ইতিহাস জানা দরকার। আপনি কোনো মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করুন। বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি আপনার ডায়াগনোসিস নিশ্চিত করে চিকিৎসা-পরিকল্পনা দেবেন এবং কিছু ঔষধও দেবেন। সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকলজিস্টের কাছে রেফার করবেন। ঔষধ ছাড়া এবং ঔষধসহ চিকিৎসা যদি গ্রহণ করেন তাহলে উন্নতি হবে। তবে চিকিৎসাটি দীর্ঘসময়ব্যাপী করতে হবে। অসুখটিও দীর্ঘসময়ের। এ রোগের চরিত্র হলো রোগটি উঠানামা করে। যখন টেনশন বাড়ে তখন অসুখটা বাড়ে, যখন টেনশন কম থাকে অসুখটা কম থাকে। চিকিৎসা নিলে তুলনামূলক ভালো থাকা যাবে। কাজেই অবশ্যই আপনার চিকিৎসার আওতায় আশা উচিত বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ।

ভার্চুয়াল জগতে হারিয়ে বাস্তবতা কী ভুলে গিয়েছি

আমি নাঈম, আমার বয়স ১৭। আমি শুচিবায়ুগ্রস্ত, তরল জাতীয় পদার্থ আমার শরীরে লাগলে অথবা ধুলা জাতীয় ময়লা লাগলে অস্থিরতা বোধ হয়। বাসায় কোনো একটা জিনিস উল্টে থাকলে, সেটা সোজা করতে হয়-হোক সেটা পাপোষ বা জুতা কিংবা মগ-জগ। অন্যদিকে আমার ইনসমনিয়া, সোশ্যাল ফোবিয়াও আছে। বয়স ১৮ হতে যাচ্ছে, ২০১৫ সাল থেকে ঘরোয়া আসক্তি ও ভার্চুয়াল জগতে হারিয়ে বাস্তবতা কী ভুলে গিয়েছি। আচরণগত দিক দিয়ে খুব বদমেজাজি হয়ে উঠেছি। মানসিক চেতনা, ক্লান্তি দূর করার কোনো উপায় থাকলে, ঔষধ থাকলে আমাকে জানান। আমি, Indever/Nextrial/Disopan (ক্লোনাট্রিল) সেবন করি। মনের উল্লম্ফনতা বাড়াতে Frenxit কেমন কাজ করে?

অধ্যাপক ডা. নাহিদ মাহজাবিনর মোরশেদ : তোমার OCD

পরামর্শ দিয়েছেন

অধ্যাপক ডা. নাহিদ মাহজাবিনর মোরশেদ
অধ্যাপক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ডায়াগনোসিস এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি থেকে আমার মনে হচ্ছে তুমি হয়তো কোনো মনোরোগবিদ্যা বিশেষজ্ঞকে দেখিয়েছ। এখানে যে তোমাকে শুধু ঔষধ খেয়েই যেতে হবে তা নয়, OCD-তে চিকিৎসার অংশ হিসেবে সাইকোথেরাপিটাও খুব জরুরি। সাইকোথেরাপির মধ্যে কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, কগনেটিভ থেরাপি, বিহেভিয়ার থেরাপি এমন অনেক ধরনের সাইকোথেরাপি আছে যেটা তোমার OCD-তে কাজে লাগতে পারে। যদি তুমি বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই উনার কাছে ফলোআপে যাও আর যদি এখনো না দেখিয়ে থাক তাহলে অবশ্যই তোমার উচিত হবে একজন মনোরোগবিদ্যা বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে তোমার অসুখটা কী সেই রোগটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। চিকিৎসা-পদ্ধতিতে মেডিসিন এবং সাইকোথেরাপিসহ আরো অনেকগুলো জিনিস কাজ করতে পারে। পরিবারের লোকজনের সাহায্যও প্রয়োজন হতে পারে। তোমাকে আগে তোমার রোগটা সঠিকভাবে বুঝতে হবে তাহলে তুমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। OCD রোগটা একটু দীর্ঘমেয়াদি রোগ। যার কারণে দীর্ঘমেয়াদে ঔষধ খেতে হয়, চিকিৎসা করতে হয়। তুমি শুধু ঔষধ-নির্ভর হতে চাচ্ছ ঔষধের মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান করতে চাচ্ছ, কিন্তু ঔষধ দিয়ে সব সমস্যার সমাধান আসবে না। চিকিৎসার যে পদ্ধতিগুলো আছে সবগুলোর সমন্বয়ে হবে তোমার চিকিৎসা। তোমাকে অবশ্যই চিকিৎসকের মতামত অনুযায়ী চলতে হবে আর ঔষধ-নির্ভর না হয়ে, তোমার চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করাও জরুরি–সেটা সাইকোথেরাপির মাধ্যমে হয়ে থাকে। ইনসোমেনিয়া, সোশ্যাল ফোবিয়া আলাদা চিকিৎসা না। এমনও হতে পারে OCD-এর অংশ হিসেবে এই জিনিসগুলো আসতে পারে। সুতরাং তোমার সুনির্দিষ্ট ডায়াগনোসিস, সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চলতে হবে তাহলেই তুমি তোমার সমস্যা থেকে বের হতে পারবে। ধন্যবাদ।

হার্টবিট বাড়লে আরো ভয় পাই, এই বুঝি আমার হার্টফেইলর হবে

আমি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত। আমি ক্লাস নাইন থেকে মানসিক সমস্যায় ভুগছি। আমি জামায়াতের সাথে নামাজ পড়তে পারি না, পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিতে পারি না, ট্রেনে-বাসে-লঞ্চেসহ অনেক যানবাহনে উঠতে পারি না। আবদ্ধ কোনো জায়গায় থাকতে পারি না, ভিড়ের মধ্যে যেতে পারি না। আমার মাথায় মৃত্যুভয় কাজ করে। আমার মনে হয় আমি নামাজে দাঁড়ালে এখান থেকে বেরোতে পারব না, তখন আমার হার্টবিট বাড়ে। হার্টবিট বাড়লে আমি আরো ভয় পাই, এই বুঝি আমার হার্টফেইলর হবে। প্রতিটা কাজেই এমন চিন্তা আসে। জীবনযাপন করা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ছে। আমাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট setra 50 (১+০+০) খাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন আর breathing exercise করার জন্য বলেন। ঔষধটা খাওয়াতে সারাদিন কিছুক্ষণ পরপর হামি আসে আর ঠোঁট শুকিয়ে যায়। মাঝেমধ্যে গলাও শুকিয়ে যায়। ঔষধ

পরামর্শ দিয়েছেন

অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক
প্রাক্তন অধ্যাপক, মানসিক রোগ বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও প্রাক্তন পরিচালক, পাবনা মানসিক হাসপাতাল

খাচ্ছি ৫ দিন ধরে। এইরকম পরিস্থিতিতে আমার কী করা উচিত?

অধ্যাপক মাহফুজ : তুমি সম্ভবত এগোরাফোবিয়া নামক এক ধরনের এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডারে ভুগছো। এটি একধরনের এ্যাংজাইটির রোগ; যার কারণে রোগী মনে করে এর থেকে তার পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই। যেমন : সিনেমা হল বা এমন কোনো মিটিং যেখান থেকে সহজে বের হওয়া যায় না–এরকম জায়গায় যদি কোনো শারীরিক লক্ষণ দেখা দেয়, যেমন : হার্টবিট বেড়ে যাওয়া, মাথা ঘুরানো, দম বন্ধ হয়ে আসা ইত্যাদি তখন সে কোনো হেল্প নিতে পারে না। এ ধরনের পরিস্থিতি যখন হয় তখন এটাকে আমরা ফোবিয়া বলি। ফোবিয়া হলো এক ধরনের অকারণ দুশ্চিন্তা এবং আতঙ্কিতভাব। উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার যথার্থ, যুক্তিসম্মত কারণ থাকলে সেটা ভয়। কিন্তু ভিত্তিহীন কারণে দুশ্চিন্তার নামই ফোবিয়া। সেই ফোবিয়া থেকে কেউ যখন এমন কাজ করতে শুরু করে যেটা নিজের এবং অন্যের অসুবিধা, ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটা রোগ। এটা সাধারণত প্যানিক ডিজঅর্ডারের সাথে আবার কোনো সময় সোশ্যাল এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডারের সাথে মিক্সডও থাকতে পারে। এখানে চিকিৎসা দু-রকম হতে পারে। যথা : ফার্মাকোথেরাপি আর সাইকোথেরাপি (সিবিটি বা কগ্নেটিভ বিহেভিয়ার থ্যারাপি)। যেহেতু তোমার ফোবিক সিচুয়েশন আছে তাই তোমাকে এক্সপোজার থেরাপি দিতে হবে। আর ফার্মাকো-থেরাপির জন্য বেঞ্জোডায়াজিপিন নামক ঔষধ খেতে হবে। যে-কোনো এন্টিডিপ্রেসেন্ট প্রথমে অল্প মাত্রায় দিতে হয় এবং আস্তে আস্তে বাড়ানো হয়। এরজন্য অনেক সময় লাগতে পারে এবং সামান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নাই ; কারণ কিছুদিন পর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যায়। যদি না হয় তবে তুমি নিকটস্থ কোনো মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মানসিক রোগ বিভাগে অথবা কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ গ্রহণ করো।

হাত-পা কাপাকাঁপি করে, বাসায় ফোন দেয়ারও শক্তি থাকে না

আমি ফারুক। আমার বয়স ২১ বছর। বেশ আগে থেকেই আমি কিছু মানসিক সমস্যায় ভুগতাম। প্রায় ৪ বছরের কাছাকাছি এসব সমস্যায় ভুগছি। আমি এটাকে পাত্তা দিতাম না, সাধারণভাবে বাঁচার চেষ্টা করতাম। সাধারণ মানুষ যেভাবে চলাফেরা করছে, তা আমার সাথে মিলছে না। কোনো কাজ করতে গিয়ে বাজে টেনশন চলে আসে এবং কাজটি আবার করতে হয়। আমার মধ্যে মৃত্যুভয় তৈরি হয়েছে। এখন যে সমস্যা তা হলো–প্রায় ৩ মাস যাবৎ শুধু ভয় পাই, একা চলাফেরা করতে পারি না। এমনকি ঘর থেকে বের হলে, বাইরে একটু দূরে গেলে, অপরিচিত কাউকে দেখলে দমবন্ধ হয়ে আসে। তখন হাত-পা কাঁপাকাঁপি করে, বাসায় ফোন দেয়ারও শক্তি থাকে না। গত দু-চার দিন ধরে ঘরেই রয়েছি। মনে হয়, আমি এখনই অসুস্থ হয়ে পড়ব, ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। রাতে সবাই ঘুমাতে গেলে আমার ভয় লাগে, সারাদিনও ভয় লাগে। মনে হয়, এখন অনেক রাত হয়ে গেছে, রিকশা পাওয়া যাবে না, হাসপাতালে কীভাবে যাব। এছাড়া ফোন বাজলেও বুক ধড়ফড় করতে থাকে। আমার ব্লাড প্রেশার কমে এবং বাড়ে। ৬ মাস যাবৎ ঔষধ (ইনডেভার ১০) সকালে একটা, রাতে একটা খাই। ঔষধ (ফেমালন ০.৫) সকালে একটা খাই। তবু কাজ হচ্ছে না। সমাধান চাই।

ডা. মহাদেব : আপনার সমস্যা প্রায় ৪ বছর যাবৎ। তবে একটি কাজ বারবার করছেন তারপরও মনে হচ্ছে কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে না। এটার সাথে এখন আরও কিছু কিছু সমস্যা নতুন করে যুক্ত হয়েছে ৩ মাস যাবৎ। উপসর্গের দিকে তাকালে দেখা যায় আপনি Anxiety Disorder-এ ভুগছেন। তবে শুচিবাই বা OCD, Panic Disorder, Agoraphobia এগুলো Anxiety Disorder-এর-ই প্রকারভেদ। সমস্যা

পরামর্শ দিয়েছেন
অধ্যাপক ডা. মহাদেব চন্দ্র মন্ডল
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ,
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

অল্প কিছুক্ষণ স্থায়ী থাকে কিনা, কারণ ছাড়াই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দেয় কিনা, মনে জোরপূর্বকভাবে চিন্তা আসে কিনা এবং মন থেকে সরাতে গেলে উদ্বেগ বোধ হয় কিনা? আবার উপসর্গগুলো কতক্ষণ স্থায়ী হয় এবং মাসে কয় বার হয়? এ প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। যা হোক এসেসমেন্টের জন্য আপনার এ ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ ও চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়াই উত্তম। চিকিৎসা হবে বিজ্ঞানসম্মত সাইকোলজিক্যাল থেরাপি এবং ঔষধের মাধ্যমে। তবে রোগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া এবং মনে সাহস অর্জন করা ও চিকিৎসকের পরামর্শে রোগের তীব্রতা অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় (Therapeutic dose) সঠিক নিয়মে নির্দিষ্ট সময় (ছয় থেকে নয় মাস এবং ক্রনিক কেসে দুই বছর পর্যন্ত) অনুযায়ী ঔষধ সেবন এবং সময় মতন ধৈর্যসহকারে ফলোআপ করলে আপনি এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এর জন্য আপনি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগে যোগাযোগ করতে পারেন।

কীভাবে গুছিয়ে কাজ করবেন

মাহজাবিন আরা শান্তা
প্রতিবেদক, মনের খবর।

আমাদের জীবনে দিনের বেশিরভাগ সময় পার হয় কাজের ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিনই ভাবছেন কোনো কাজই ফেলে রাখবেন না। কিন্তু তারপরও অনেক কাজ রয়ে যায়। তাই যদি একটু গুছিয়ে কাজ করা যায়, তাহলে আপনার কাজগুলো করা সহজ হবে এবং সব কাজই সময়মতো শেষ করতে পারবেন।

বাসায় বা কর্মক্ষেত্রে কাজ ঠিকমতো গুছিয়ে না করতে পারার কারণে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া কাজ ঠিকমতো গুছিয়ে করতে না পারলে একধরনের অশান্তি সারাক্ষণই মনের ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে। আবার অগোছালো কাজ করতে গিয়ে আমরা একই কাজে বেশি সময় নষ্ট করি। তাই একই কাজে বাড়তি সময় ব্যয় করতে না চাইলেও কাজ গুছিয়ে করার অভ্যাস তৈরি করাটা অত্যন্ত জরুরি।

কাজ গুছিয়ে করার কিছু উপায় :

- গুছিয়ে কাজ করার প্রথম পদক্ষেপ হলো নিয়মিত ডায়েরিতে কাজের পরিকল্পনা লিখে রাখা। সপ্তাহের ছুটির দিন একটু সময় বের করে বাড়ি ও অফিসের কী কী কাজ আছে এবং কখন সেগুলো করবেন তার একটা পরিকল্পনা ডায়েরিতে লিখে রাখুন।
- প্রতিদিনের কাজের একটা ছক তৈরি করুন। প্রতিদিনের কাজের পরিকল্পনা যদি আপনি আগের দিন রাতেই ঘুমাতে যাবার আগে এই ছকে লিখে রাখেন তাহলে সকালে ঘুম থেকে উঠেই সেটা দেখে আপনি ধারণা নিতে পারবেন যে সারাদিনে ঠিক কখন আপনার কোন কাজটি করতে হবে। এতে করে কাজের একটা ধারা বজায় থাকে।
- যদিও আপনার রুটিনে থাকা সব কাজই গুরুত্বপূর্ণ, তবুও গুরুত্ব অনুসারে কাজ ভাগ করে নেয়া উচিত। অর্থাৎ যে কাজটির গুরুত্ব বেশি বা দ্রুত সেরে ফেললে আপনার জন্য সুবিধা হয়, সেটি আগেভাগেই করে ফেলুন। এতে করে আপনার মানসিক চাপ কমে যাবে এবং অন্যান্য কাজগুলো করাও সহজ হবে।
- প্রত্যেকটি কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করুন এবং প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি সময় রাখার চেষ্টা করুন। কারণ, অনেকসময় কোনো একটা কাজে সময় একটু বেশি লাগতে পারে, তখন পরের কাজের সময়টাও ঠিক থাকে না। তাই সময় একটু বেশি রাখলে এই ঝামেলা এড়ানো যায়।
- আপনার পারিবারিক আর প্রাতিষ্ঠানিক কাজগুলোকে আলাদা করে সে অনুযায়ী কাজ ভাগ করে নিন। যেদিন অফিস বা কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ কম থাকবে সেদিন নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কাজগুলো সেরে নিন।
- একসঙ্গে বেশি কাজ করার চেষ্টা করবেন না। কাজের পরিকল্পনা এমনভাবে করুন, যেন কোনোদিনই আপনার ওপর বেশি চাপ না পড়ে।
- একটা কাজ শেষ না করে আরেকটা কাজ শুরু করবেন না। তাহলে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না। তাই যে কাজটা প্রথমে শুরু করবেন সেটা শেষ করে তারপর অন্য কাজ করার চেষ্টা করুন।
- কোনো কাজেই তাড়াহুড়ো করবেন না। কারণ, তাড়াহুড়োয় কাজে ছোটখাটো অনেক ভুল হতে পারে। অতএব সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে কাজ করুন।
- বাসায় এবং অফিসের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটা নির্দিষ্ট ড্রয়ারে রাখুন। আর ভুলে যাওয়ার সমস্যা থাকলে একটা ছোট নোটবুকে লিখে চোখের সামনে কোনো এক জায়গায় রাখুন।
- যেখানকার জিনিস সেখানেই রাখার অভ্যাস তৈরি করুন। অর্থাৎ কোনো একটা জিনিস যেখান থেকে নিয়ে কাজ করবেন, কাজ শেষ হলে সেখানেই আবার রেখে আসুন। এই অভ্যাস রপ্ত করতে পারলে কোনো জিনিস খুঁজতে সময় নষ্ট হবে না।
- যে জিনিসগুলো সবসময় কাজে লাগে, সেগুলোকে হাতের কাছেই রাখুন। তবে খেয়াল রাখতে হবে বিভিন্ন জিনিস একসাথে রাখা যাবে না। আলাদা ধরনের জিনিস আলাদা রাখার চেষ্টা করুন। তাহলে খুঁজে পেতে সহজ হবে।
- গোছানো কাজ অধিক ফলপ্রসূ হয়। জীবনকে কম চাপযুক্ত করার জন্য কাজ গুছিয়ে করার অভ্যাস রপ্ত করতে হবে এবং এতে কোনো কাজের পেছনে আর বাড়তি সময় ও পরিশ্রম দিতে হবে না।

মনের খবর কুইজ

মে ২০১৮ সংখ্যার বিভিন্ন লেখা ও নিবন্ধ থেকে তথ্য নিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো তৈরি করা হয়েছে। সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে দু'জনকে নির্বাচন করা হবে। দু'জন পাবেন মনের খবরের আগামী ছয়টি ফ্রি সংখ্যা।

প্রশ্ন–

১. ১৮৮৬ সালে শ্রমিকদের ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকরা সমাবেশ করে কোথায়?
২. মা দিবসের আধুনিক প্রবক্তা কে?
৩. কী ধরনের মানসিক রোগের ক্ষেত্রে অকুপেশনার থেরাপি দেয়া হয়? (তিনটি উপসর্গের নাম উল্লেখ করুন)
৪. বয়স্কদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কত সালে পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন পাস করে সরকার?
৫. মৃত্যুকালে মার্কস কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?
৬. সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় কেমোথেরাপি প্রয়োগের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন কে?
৭. দুর্যোগের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় কী কী মানসিক সমস্যা হতে পারে?
৮. ধূমপায়ী-বেষ্টিত কর্ম-পরিবেশে অধূমপায়ীদের ফুসফুস ক্যান্সারের ঝুঁকি কত শতাংশ বেশি?

প্রতিটি প্রশ্নের নম্বরের পাশে সঠিক উত্তরটি লিখে পাঠাবেন। অবশ্যই মনের খবর-এর সংখ্যার নম্বর, আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর পাঠাবেন। উত্তর অবশ্যই আগামী ৩১ মে ২০১৮-এর মধ্যে আমাদের ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
নির্বাচিত হওয়ার পরবর্তী ছয় মাস উত্তর পাঠাবার দরকার নেই।

উত্তর পাঠাবেন
ই-মেইল : quiz@monerkhabor.com
ডাক : ৬৩১/এ, (৩য় তলা) মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

** নির্বাচিত হওয়ার এক সংখ্যা পর থেকে আপনার কপি পাবেন।

মার্চ সংখ্যার কুইজ জিতেছেন
এইচ এম মু'তাসিম বিল্লাহ (সীমান্ত), বড় মগবাজার, ঢাকা
নাসরিন নাহার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক খবর পাঠান

মনের খবর-এ মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো অনুষ্ঠান, সেমিনার এবং সাংগঠনিক তৎপরতার সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হবে। যে কোনো অনুষ্ঠানের আগেই অনুষ্ঠানের তথ্য জানালে আমাদের প্রতিনিধি সেটা সংগ্রহ করবেন। সংবাদ পাঠানোর ক্ষেত্রে বিজয়ের সুতন্নি এমজে কিংবা ইউনিকোড ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা–
ই-মেইল
news@monerkhabor.com
monerkhabor@gmail.com
ফেসবুক
www.fb.com/monerkhabor/inbox

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED

Deposit Products

- Savings Bank Account
- Current Deposit Account
- Dwigun Sanchaya Prakalpo
- Pubali Sanchaya Prakalpo
- Shiksha Sanchaya Prakalpo
- Pubali Pension Scheme
- Fixed Deposit Receipt
- Monthly Profit Based Fixed Deposit
- Special Notice Deposit (SND)
- Monthly Profit Based Small Deposit
- Target Based Small Deposit
- Pubali School Banking

For your financial management and plans, please contact the nearest Branch. Our 465 Branches are online & ready to assist you.

সোনামনির জন্মদিনের
সেরা উপহার

ইকরিমিকরি

বই

১০০০ । ১২০০ । ১৫০০
টাকার তিনটি উপহার প্যাকেজ
সঙ্গে ব্যাগ ও হোম ডেলিভারি ফ্রি

এছাড়া বেশ কিছু
বইয়ে রয়েছে

৪৫%
পর্যন্ত ছাড়*

* শর্ত প্রযোজ্য

০১৭১৭০৭২৩৭৩, ০১৬১৭০৭২৩৭৩
ikrimikrimail@gmail.com ikrimikri.com
ikrimikriworld

স্বীকৃতির সাথে মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগের সর্বাধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানের সেবা দিয়ে যাচ্ছে

(বীকন গ্রুপ এর একটি সমাজ উন্নয়ন মূলক উদ্যোগ)

বীকন পয়েন্ট

- ২৪ ঘন্টা রোগী ভর্তি করা হয়
- মহিলা রোগীদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ও নিরাপদ ব্যবস্থা রয়েছে

BEACON Point
Light for life

বাড়ী # ৪, রোড # ২৩ এ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
ফোন : ০১৭১৩০১২৬৫৭, ০১৯৮৫৫৫০৬৭৮, ০১৯৮৫৫৫০০৬৮-৯
web: www.beaconpointbd.com, www.facebook.com/beconpointbd